ইমতিয়ার শামীম
আমরা
হেঁটেছি
যারা

বাবার তর্জনী ধরে ভোরের ঘাস-শিশির মেখে হাঁটতে শুরু করে সে; মা, মণীষা, মামুন, শুভ্রা, আইয়ুব, মারিয়ার সঙ্গে সে হেঁটে যায় আর গোটা ইতিহাসসহ ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন... রাজাকার, মুজিববাহিনী, রাতবাহিনী, লালবাহিনী, গণবাহিনী; জলপাই-রগকাটা-ঈগল-পেঙ্গুইনবাহিনীও চলতে থাকে সমান তালে ডান-বাম, ডান-বাম...

কিন্তু, নদীর তীরে একই পানিতে তো মানুষ দু'বার ডুবতে পারে না...মানুষ-তাড়ুয়ারা তার চারপাশে ঘুরঘুর করে, সে হারাধনের সন্তান খুঁজে ফেরে; তথাগত খুঁজে ফেরে...ইতিহাসের পথ ধরে হেঁটে-চলা এই আখ্যানই আমাদের শোনান ইমতিয়ার শামীম।... তথাগতের নিস্পৃহ খোঁজাখুঁজি শহরায়নের গদ্যবিস্তার করে যা জটিলের এপিঠে আর সহজের ওপিঠে কত সহজ আর সরলতায় আকীর্ণ সত্য! ধরা যায় যেন-বা ছোঁয়াও যায়...গ্যালিলিও... সক্রেটিস হাঁটতে হাঁটতে হেমলক পান করছেন,...তথাগত তখনও একা হেঁটে চলেছে... ধোঁয়া-ওড়া ভাতের স্বপ্ন নিয়ে এই সত্য সে কোথায় লুকায়, অতঃপর...মানুষ... যুদ্ধে আমরা তাদের পরাজিত করব, না আমাদের পরাজয় বরণ করা উচিত...
তথাগত হেঁটে চলে...

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা
ফেব্রুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

প্রকাশক
জনান্তিক
৫০ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
আর্কেডিয়া কমিউনিকেশনস্
৪১/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-781-004-5

মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা

উৎসর্গ

সবুজ অনীক মনি

সুব্রত বসাক	জয় ইসলাম
গৌতম সাহা	অরুন দাশগুপ্ত
নব কুমার	প্রশান্ত সাহা

অনেক রাতে আমাদের জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে মণীষার মুখের ওপরে অধরা মায়ার জাল বুনতে থাকে। ঠিক তখনই আমি কড়া নাড়ার শব্দ শুনি। বেশ জোরে একবার আওয়াজ তুলেই সে ধ্বনি কিছুক্ষণের জন্যে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। আমি তবু জেগে উঠি। বর্গীর জন্যে আমি প্রতিনিয়ত প্রতীক্ষমান এই বালককালেও। আমি প্রতীক্ষমান বলেই হয়তো আর কারও ঘুম ভাঙে না। যে মা আমাকে পই পই করে সাবধানে ঘুমাতে বলেছে, শুয়ে পড়তে বলেছে একটু সকাল-সকাল যাতে মাঝরাতে কিংবা ভোর-রাতে সহজেই কোনও আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে যায় সেই মাকেও দেখি ঘুমাচ্ছে নির্বিবাদে। ঘরের ফ্যাকাশে আলোয় কেবল তার শাড়ির কালো প্রান্তটা হাহাকারের বিস্তৃতি নিয়ে জেগে রয়েছে। আর মণীষার বুকের ওপর আছড়ে পড়া চুলে বয়ঃপ্রাপ্তির আভাস আস্তে আস্তে মাথা তুলছে। প্রথমে আমার মনে হয় রাত বাহিনীর লোক এসেছে নিস্তব্ধে নিমখুন শুমখুনে বাড়ির উঠোন, উঠোনের খড়ের গাদা কিংবা একেবারে ঘরের মেঝেটাই মথিত করে রেখে যেতে। তারপরই অস্পষ্ট বুটের আওয়াজ শুনে ঠিক-ঠিক বুঝে নেই রক্ষীর দল এসেছে বাবার খোঁজে। রাত বাহিনীর লোকেরা বুট পরে না, এত জোরে কড়া নাড়ে না। তারা আসে নিস্তব্ধে, ঠোঁটটা ঢেকে রাখে খুব ভালো করে গামছা দিয়ে যাতে গলার স্বর কেউ চিনতে না পারে। হঠাৎ গুলির আওয়াজে আশেপাশের মানুষজন বুঝতে পারে কেউ আবারও মারা গেল আর হননযজ্ঞ শেষে নিশ্চয়ই রাত বাহিনী চলে গেল। কোনও কোনও সময় ওরা গুলির আওয়াজও যাতে অস্পষ্ট হয়ে যায় আর নিজেরা নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে পারে সেজন্যে শিকার করা মানুষটাকে নিয়ে যায় খোলা মাঠে, চাষবাসের খেতে। হাত মুখ পা বাঁধা শিকার,- যাকে ওরা বলে শ্রেণীশত্রু, সে হয়তো আকাশমুখী, কিন্তু আকাশটাকেও দেখে যেতে পারে না মরার আগে।

কিংবা কখনও তারা গ্রামবাসীদেরও ডেকে আনে। বুঝানোর চেষ্টা করে শ্রেণীবিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, এবার তবে শ্রেণীশত্রু খতম করার পালা। যাকে মারা হবে সে হলো শ্রেণীশত্রু, তার ৫০ বিঘা জমি আছে, এত জমির ওর দরকার কি? এইজন্যেই ওর ছেলে কলেজে পড়তে পারে, অথচ আর কেউ খেতেই পায় না ভাল করে। সারাদিন কাজ করার ক্লান্তি নিয়ে প্রায় ঘুমন্ত চোখে গ্রামবাসীরা হয়তো এসব ভাল করে শুনতেও

পায় না, তন্দ্রাচ্ছন্নতা তাদের নিয়ে যায় অন্য কোনও নিরাপদ পৃথিবীতে; আর যারা শোনে কৌতূহল নিয়ে কিংবা ভয়ে ঘুমাতে না পেরে তারা সেসব বুঝতে পারল কি না সে সত্য চাপা পড়ে থাকে কাটা রাইফেল, পাইপগান, পয়েন্ট টু টু বোরের পিস্তল কিংবা চাইনিজ রাইফেলের উদ্যত থাবার নিচে। এমনকি যখন গুলির আওয়াজে আকাশবাতাস প্রকম্পিত হয়ে একজন মানুষের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে কিংবা বিরাট রামদা-র কোপে মুণ্ডহীন শরীর থেকে গলগল করে রক্তধারা বেরিয়ে এসেই প্রাণপণে নিজের লজ্জা ঢাকার জন্যে চেষ্টা করে মাটির গভীর তলদেশে মিলিয়ে যেতে, তখনও গ্রামবাসীদের চোখগুলো থাকে কোনওরকম প্রতিক্রিয়াবিহীন। রাত বাহিনীর কেউ তাদের বোকা বুড়োর গল্প বলে। বলে চিনের চেয়ারম্যানের কথা। কবে কোনকালে আমাদের ফয়েজ চাচা কোথায় শুনেছিল সেখানকার লোকেরা তেলাপোকা খেতে খুব ভালবাসে আর মেয়েদের জন্ম নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে পরিয়ে দেয়া হয় লোহার জুতো,– সেই ফয়েজ চাচাই তখন কেবল একটু নড়েচড়ে বসে। রাত বাহিনীর লোকরা চলে যাওয়ার পরে তার এতক্ষণ ধরে চেপে রাখা কথা মুখের অর্গল ভেঙে ছুটে বেরয় : এই ছেলেরা চি'নির অনেক কতাই জানে না ভাল করে, বুঝতি পাইরলে? চি'নির মানুষিরা হাত দিয়ে ভাত খায় না। আমরা যে কাটা দিয়ে উলির সুইটার বুনি সেইরাম দুডো কাটা দিয়ে সবকিছু খাওয়াদাওয়া করে। আর খুব ভাল তরবারি খেলা জানে। চি'নির যে প্রাচীরডা আছে সেখান দিয়ে ছয়ডা ঘোড়া পাশাপাশি দৌড়াতি পারে। বলতে বলতে চিন সম্পর্কে অনেক কিছু জানার গৌরবে ফয়েজ চাচার মুখটা চকচক করতে থাকে। লোকজন তার সে গৌরবের অংশীদার না হয়ে দ্রুত চলে যায় বাকি রাতটা নির্বিঘ্নে ঘুমানোর জন্যে।

রাত বাহিনীর সঙ্গে রক্ষী বাহিনীর আকাশপাতাল তফাৎ। তাদের কোনও দিনরাত নেই। নেই এত সাবধানতা। যে কোনও মুহূর্তে তারা বুটের গমগম আওয়াজ তুলে যেতে পারে যে-কোনও স্থানে। বুটের তলায় রাস্তার অমসৃন খানাখন্দে জমে থাকা পানিও ভয় পায় ছিটকে উঠতে। এই বারো তেরো বছর বয়সেই আমি এতকিছু জেনে গেছি খুব ভালোভাবে, জেনে গেছি রক্ষী বাহিনীর জামার হাতায় তর্জনি তোলা কাটা কব্জি আঁকা থাকে, বড় চুল মোটেই পছন্দ করে না তারা। অবশ্য তারা কি পছন্দ করে তাও বোঝা যায় না ভাল করে। আমাদের বাড়ি থেকে বেশ দূরে স্কুল ঘরে ক্যাম্প পেতেছে তারা রাত বাহিনীর লোকেরা এক রাতে এসে সোবহান খানের গলা কেটে রেখে যাওয়ার পরে। মাঝে মাঝে বাবার খোঁজেও আসে তারা। যেমন আজ এসেছে। কড়া নাড়ছে ঘটঘট আওয়াজ তুলে। আমি দরজা ভাঙার আগেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি দরজাটা খুলে দিতে। মা-ও উঠে বসে হুড়মুড় করে। মণীষা ভয়ার্ত চোখে মায়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। আর দরজা খুলতেই রক্ষীর দল হুড়হুড় করে ঢুকে পড়ে 'কনে, কনে হারামজাদা' বলতে বলতে। আমার ঠোঁট দপদপ করে কাঁপতে থাকে। জিভের

ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে তুলি বারে বারে। ওদের বলা সেই হারামজাদা মানে আমার বাবার খবর আমরাও জানি না কতদিন হয়ে গেল। কিন্তু বার বার বলার পরেও বিশ্বাস করানো যায় নি ওদের এই সত্য। এখন আর কিছু বলি না আমরা কেউই, শুধু না বলা কথাগুলো নীরবে আমাদের ঠোঁটের ওপর কম্পন তুলতে থাকে। নীরবে আমরা দেখি ওদের খানা-তল্লাশি, দেখি ভেঙে ফেলল মাচার ওপর রাখা হাড়ি-কোলা, ভেতর থেকে ছড়িয়ে পড়ল আসন্ন খন্দের জন্যে সযত্নে রেখে দেয়া ফসলের বীজ। কিংবা কখনও ওরা ভেঙে ফেলে গরুদের খড় ভিজিয়ে খাওয়ানোর নান্দা, একটা ষাড় খুলে নিয়ে যায় অনেকদিন পরে ভালোমন্দ খাবে বলে। রক্ষীদের অনেকদিন মানেই প্রতিদিন তা এতদিনে হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছি আমি। প্রতিদিনই ওরা হানা দেয় কারও না কারও ঘরে, গরু-ছাগল না হলে মোরগ-মুরগি ধরে নিয়ে যায়। আর বিকৃত দেঁতো হাসি ছুঁড়ে প্রতিবারই বলে, অনেকদিন ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া হয় না, কিছু মনে কইরবেন না।

আমি বা আমরা কিছু মনে করি না। কেননা খুব সহজেই এ ক'দিনে আমি বড় হয়ে গেছি। মানুষের বড় হওয়া নিয়ে অজস্র ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু সব ব্যাখ্যাই এখন মিথ্যা আর হাস্যকর মনে হয় আমার কাছে। আমি বড় হয়ে যাই মাত্র একদিনের ভেতর, আর সত্যি করে বলতে গেলে মাত্র একটা ঘটনা ঘটার মধ্যে দিয়ে। মনে হয় ওই ঘটনা কবে ঘটবে সেই জন্যেই প্রতীক্ষা করছিলাম আমি অনন্তকাল। কবে আমার মা মারা গেছে, কবে বাবা আবার বিয়ে করেছে কিছুই আমার স্মৃতিতে নেই স্পষ্ট করে, এ-ও আমি মনে করতে পারব না কবে মণীষাকে প্রথম দেখি। আমাকে শুধু মাঝে মাঝে এমত স্মৃতি আক্রান্ত করে যে গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি বালক আমি। আমার ডান হাতের তর্জনিটা বাবা সযত্নে ধরে রেখেছে যেন আমি হারিয়ে যাব। কখনও ঠাণ্ডা বাতাস, কখনও-বা মৃদু শিশিরের পতন আমাদের স্পন্দন ছুঁয়ে যাচ্ছে যত্ন করে। ভোরের আলোয় ঝরে পড়ছে স্নিগ্ধ শিউলি ফুল। আমরা থমকে দাঁড়াই, কিংবা আমরা হাঁটতেই থাকি শিউলি ফুলের মতোই ঝরতে ঝরতে ভোরের আলো কখন আমাদের অবগাহন করবে সেই প্রত্যাশায়। হাঁটতে হাঁটতে আমার বয়স কমে যেতে থাকে। আমি এত তর ণ হয়ে যাই যে আমাকে কিশোর বলে বিভ্রম হয়, এত কিশোর হয়ে যাই যে আমাকে বালক বলে ভুল করা যায়, এত বেশি বালক হয়ে যাই যে আমাকে শিশু বলে মনে হতে থাকে। তখন আমার নিঃসঙ্গ, সদ্য বিপত্নীক বাবা আমাকে নানাভাবে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে থাকে। আর আমিও কি ভাবে যেন টের পেয়ে যাই আমার মা আর কোনওদিন ফিরে আসবে না। বাবা আমাকে তার পিঠে করে কখনও উল্টানো পৃথিবী দেখায়, কাঁধে চড়িয়ে অনেক দূরের আকাশ কোথায় গিয়ে ডুব দিয়েছে তাও দেখায়, কখনও-বা বুকে করে আমার থুতনিটা তার কাঁধে ঠেকিয়ে পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে ঘুম পাড়ায়। এইভাবে উল্টানো পৃথিবী দেখতে দেখতে, আকাশের ডুবসাঁতার দেখতে দেখতে, ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে আমি একদিন ভুলে

যাই আমার একজন মা ছিল, সেই মা কোথায় যেন চলে গেছে, আর কখনও ফিরেও আসবে না। এমনকি তার ফিরে না আসার অমোঘতাও আমার মনে কোনও ক্রন্দন জাগাতে পারে না। আমার বয়স তখন কম করে হলেও চারের মতো। এই বয়সটা মায়ের চেহারা ভুলে যাবার জন্যে যতই উপযোগী হোক না কেন মায়ের অশরীরী শূন্যতা তৈরি করবার জন্যে নেহাৎ কম নয়। আমি তবু কোনও শূন্যতা ছাড়াই বড় হতে থাকি। এমনকি কেউ যখন মাতৃহীনতার কথা বলে একটা সহানুভূতিময় পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করে সেটাও আমার কাছে বেশ বিরক্তিকর ও অসহ্য মনে হতে থাকে।

বাবা আবারও বিয়ে করলে আমি তাই এর গুরুত্ব একটুও বুঝতে পারি নি, আর এখন মনেও নেই ভাল করে ঠিক কবে বিয়ের এই ঘটনাটা ঘটেছিল। আবার এরকমও হতে পারে সৎ-মাও তো বিধবা ছিল; বয়সের অভিজ্ঞতায় তারা আর কেউ কারও অতীত নিয়ে নাড়াচাড়া করে নি, বরং একজন আরেকজনের ছেলেমেয়েকে ভালোবাসতে পেরেছে। অনেকটা আদিম কালের মতো। কে কার সন্তান সেটা বড় কথা নয়, কে কার পিতা-মাতা তা নিয়েও হিসাবনিকাশ করার কোনও প্রয়োজন নেই, সন্তানকে পৃথিবীর উপযোগী করে তুলতে হবে সেটাই বড় কথা। এতদিন বাদে আমারও আর মনে হয় না মা আসলে সৎ-মা আর মণীষাটা আসলে বোন নয়, সৎ-বোন। বাবা আবারও বিয়ে করেছে, বাবা আর তার বিছানায় আমাকে ঘুমাবার জন্যে ডেকে নেয় না, এক অদ্ভুত অদৃশ্য নিয়মে এখন তার বিছানায় হঠাৎ নিয়ে আসা মা বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া একটা মেয়ের অলিখিত অধিকার জন্মেছে, এসব ঘটনাও আমাকে বিচলিত করে তুলে পারে নি বড় বানাতে। বাবা আমাকে চাচাদের কিংবা তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশার জন্যে কখনও-ই উৎসাহিত করে নি। সারা দুপুর আমি স্কুলে, স্কুলের পাশের বাঁশবাগানে না হয় বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড়ে কাটাতেই বেশি ভালবাসতাম। মানুষ চেনার আগে আমি বোধহয় পশু পাখি চিনেছি আরও ভাল করে। মা এলে, সঙ্গে আবার আমার বয়সী একটা মেয়ে নিয়ে এলে আমি তাই মাতৃহীন দুঃখী-দুঃখী চেহারা নিয়ে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে শেখার বদলে বরং অনেক-অনেক খুশি হয়েছিলাম। আমার চারপাশের পশুপাখির জগতে এরা উপস্থিত হয়েছিল আমারই সগোত্রীয় সঙ্গী হিসাবে।

সৎ-মা আসাতে আমাদের বাড়ির রুটিন পাল্টে গেল। আগে বাবা সন্ধ্যায় একবার বাড়ি ফিরে আমার খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাক হয়েছে কি না দেখে আবারও বাইরে বেরিয়ে যেত। আমাদের রান্না করে দিত ফতেহ্ আলীর মা, যার বয়সের দোরগড়ায় মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছিল অনেক আগেই। সারাদিন এটাসেটা কাজকাম করতে করতে সে কখন আদুরে গলায় বিভিন্ন কথাবার্তা বলে আবার কখনও-বা শাপশাপান্ত করে বাবাকে বিয়ের জন্যে অনুপ্রাণিত করত। বাবা যে সেই গঞ্জনা শুনেই বিয়ে করেছে তাও এখন

আর মনে হয় না আমার। এইসব টুকরো টুকরো স্মৃতি অবশ্য এখনও আমি ঝেড়ে ফেলতে পারি নি যে ফতেহ আলীর মা কখনও আমাকে কোলে করে দেখাতে দেখাতেও বাবাকে বলেছে আমার 'মাসুম' মুখের দিকে তাকিয়ে হলেও যেন বাবা বিয়ে করে। আসলে মায়ের অনুপস্থিতি আমার কাছে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলেও বাবার কাছে তেমন কখনও-ই হতে পারে নি। এত অল্প বয়সে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে যে তার স্নেহের কোনও স্মৃতিই আমাকে আক্রান্ত করতে পারে না। কিন্তু বাবার ব্যাপারটা অন্যরকম। আসলেই অন্য রকম। বাবা তো আর প্রেমের জন্যে বিয়ে করে নি যে চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাকে প্রেমের মৃতদেহ সারা জীবন ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াতে হবে। বাবা বিয়ে করেছিল সংসার করবার জন্যে; আরেক অর্থে অংশত যৌনতা অংশত একাকীত্ব দূর করতে। মানুষ কেন যে এখনও এই কথাটা সরাসরি স্বীকার করে না সারাজীবন এই যে সে সংসার করে, সংসারের ঘানি টানে, প্রজনন ক্ষমতা জাহির করে, ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজনকে ঘিরে স্নেহমায়ার ভাবালু আবরণ তৈরি করে ভালো মানুষের সার্টিফিকেট নেয়ার চেষ্টা করে তা আসলে তার নিঃসঙ্গতা দূর করার প্রাণান্তকর চেষ্টা,– তা বুঝতে পারি না আমি। আমার পক্ষে তো আর সম্ভব ছিল না বাবার একাকীত্ব দূর করা। আমার শিশু-শিশু মুখ দেখে বাবা যতই প্রাণিত হোক না কেন, যতই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোক না কেন, যতই মমতাসিক্ত হোক না কেন ছায়া দিয়ে সূর্যের আলোর কাছে পৌঁছে দিতে, প্রখর রোদের মুখে, প্রচণ্ড ঝড়ের তোড়ে, কূলভাঙা বন্যার প্রতিকূলে দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত করতে তা কি আর মধ্যরাতের বুনো বৃষ্টির কাছে টিকে থাকতে পারে? এমনকি জৈবিকতার কথাও যদি বাদ দেই তবু তো আমার পক্ষে সম্ভব হতো না তার ভাবনার অংশীদার হওয়ার, কিংবা অবসর ভরিয়ে দেয়ার।

তবে আমি এ-ও ভাবি মেয়েরা পারে। মেয়েরা পারে কোনও ছেলে সঙ্গী ছাড়াই জীবনের দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম মুহূর্ত পার করে দিতে। বাবা মারা যাওয়ার পরে সৎ-মায়ের দীর্ঘ পথপরিক্রমাই শুধু নয়, আরও অনেকের আচরণ আমাকে এরকম ভাবতে শিখিয়েছে। কেননা মেয়েদের একাকীত্ব এবং যৌনতার অনেকটাই শিশুরা পূরণ করে দিতে পারে। একজন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ তার সঙ্গিনীকে পরিতৃপ্ত করার জন্যে খুনসুটির যে প্রাকপর্ব ও আবহ লম্বা সময় নিয়ে প্রযোজনা করে কিংবা খুনসুটি করতে করতেই নিয়ে যেতে পারে পরিতৃপ্তির উত্তুঙ্গসীমায় শিশু তার নিজের অজান্তেই এই পৃথিবীটা চেনার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায়, পৃথিবীতে টিকে থাকার অদম্য প্রেরণায় আপনাআপনিই ওই পরিতৃপ্তি দিতে পারে, ওই দায়িত্ব পালন করে। একজন মা তার শিশুকে নিঃস্বার্থভাবে পালন করে একথা এখন আর আমি তাই বিশ্বাসই করি না। বরং মনে করি শিশুকে লালন-পালন না করেও শিশুর ব্যাপারে পুরুষেরা অনেক বেশি নিঃস্বার্থ। যে শিশু তার নিঃসঙ্গতা কাটাতে কোনও কার্যকর ভূমিকাই রাখছে না, যৌনতাতে তো আর নয় সেই শিশুর জন্যে সে সম্পত্তির পাহাড় গড়ার চেষ্টা করে, হাস্যকর হলেও সত্যি নিতান্তই

ভবিষ্যতের শিশুটির দিকে তাকিয়ে। পুরুষের প্রধান সমস্যাটা আসলে এইখানে যে সে সবার কাছে কোনও না কোনওভাবে আলাদা আইডেনটিটি চায়। যাদের প্রতিভা আছে তারা প্রতিভার বাহাদুরি দেখিয়ে, যাদের নেই তারা আর কিছু না হোক শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাবা হয়ে। মেয়েরা প্রাকৃতিক ভাবেই একটা আইডেনটিটি পেয়ে যায়, মা হওয়ার আইডেনটিটি। পুরুষ অত সুস্পষ্টভাবে বাবা হওয়ার আইডেনটিটি তো আর দাবি করতে পারে না। দাবি যাতে করতে পারে সে জন্যেই সম্পত্তির বোধ প্রতিষ্ঠা করা, সম্পত্তির কর্তৃত্ব সংক্রান্ত আইনের মধ্যে দিয়ে প্রকারান্তরে নিজের একটা আইডেনটিটি প্রতিষ্ঠা করা।

অনেকবারই ভেবেছি আমি, কি হয় বাবা না হলে? আমার শিশুকে স্নেহ করার ক্ষমতা কমে যাবে? তাহলে যে-কোনও শিশুকে দেখলেই কেন আমাদের মন ভরে ওঠে? কিংবা শেষ বয়সে নিরাপত্তা দেয়ার মতো কেউ থাকবে না? দু'টোই মিথ্যা কথা। ধর্মপ্রাণ আওরঙ্গজেবও পিতাকে বন্দি করে রেখেছিল। স্নেহ করার দখলিস্বত্ব কিংবা শেষ বয়সের নিরাপত্তা কোনওটাই নয়, পুরুষ সবকিছুই করে প্রাকৃতিক আইডেনটিটি না থাকার ক্ষতি পুষিয়ে নেবে বলে। প্রথমে তারা এর গুরুত্ব বুঝতে পারে নি, কেননা নিজেদের গুরুত্বও ছিল তাদের নিজেদের কাছেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মেয়েরা মানুষের জন্ম দিতে পারে এই সত্য তাদের বহুদিন মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। অজানা প্রকৃতির সামনাসামনি অসহায় সে চেয়েছে আরও মানুষ বাড়ুক, মাটির মতোই উর্বরা নারী,- তার তাছে সে তাই নত থেকেছে, অবনত হয়েছে, কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে। কিন্তু যেদিন থেকে পুরুষ শিখল যে কর্ষণ, বীজ ও বিষ্টি ছাড়া যেমন অতি উর্বরা জমিও নিস্ফলা তেমনি পুরুষ, সঙ্গম ও সঙ্গমের মৌসুম ছাড়া নারীও কার্যত বন্ধ্যা সেদিন থেকেই স্নেহ-মায়া-মমতার প্রাকৃতিক মানচিত্র পাল্টে গেল, মানুষের প্রতি মানুষের স্বার্থবিহীন সম্পর্কের সবুজ বিন্যাস ছিঁড়ে গেল, পুরুষ চাইল নারীর মতোই নিজস্ব পরিচয়, নিজস্ব স্বত্বা। নারী আর সম্পত্তির কর্তৃত্ব সমাধান করল এই সমস্যার। শিশুকে আদর করার ভোল ধরে নারী আসলে সেই আদি অসহায় সমর্পিত পুরুষকেই এখনও খুঁজে ফেরে,- যাকে সে ব্যবহার করতে পারবে, গড়তে পারবে, ভাঙতে পারবে নিজের মতো। শিশু তাই এখন আর নারীর কর্তৃত্ব ও গৌরবময়তার সনাক্তকরণ চিহ্ন নয়, আদি পুরুষকে খুঁজে ফেরার মহামূল্যবান উপাদান। কিন্তু পুরুষের কাছে শিশু নিঃসঙ্গতা হত্যার উপাদান নয়, শিশু তার কাছে আইডেনটিটি অর্জনের আধার। আর নারী তার একই সাথে ধারক, আবার নিঃসঙ্গতারও হন্তারক। তাই সে বার বার নারীর কাছেই ফিরে যায় পৃথিবী আসলে কতটা আলোকিত তা জানবার জন্যে।

আমার বাবাও গিয়েছিল।

তখনও আমার পায়ে ভোরবেলার শিশির লেগে আছে। অথবা আমি সখ করে একটা চোরকাটা তুলেছিলাম, তখনও তা দাঁতের ফাঁকে পিষ্ট হচ্ছে। হয়তোবা হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে গিয়েছি দূরে, বহু দূরে। বাবা ডান হাতের তর্জনি তুলে আমাকে বলছে, ওই যে দূরে পশ্চিম দিকে যে গ্রামটা দেখছ ওটার নাম আলোক দিয়ার। আর ওর পাশেই যে দেবদারু গাছওয়ালা বাড়িঘরগুলো দেখা যাচ্ছে ওটার নাম পাথারপাড়া। আর ওই যে রেলব্রিজ ওটার নিচেই পায়রা নদী। এক শরতের ভোর বেলার কথা এখনও জীবন্ত আমার কাছে। আমরা হেঁটে যাচ্ছি, রাস্তার পাশের শিউলি গাছ থেকে ফুল ঝরে রাস্তা ঢেকে গেছে। বাবা সেখানে গিয়ে থমকে গেল, আমার দিকে তাকিয়ে মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল,

তুমি কি তোমার গায়ে হালকা বাতাসের ছোঁয়া পাচ্ছ?

হ্যাঁ বাবা।

দেখ, শিউলি ঝরে গেছে, বাতাস তাই গাছটাকে একটু একটু করে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আর দেখ শুকতারা নিভে গেছে। মনে রেখ, পৃথিবীতে কেউ না কেউ তোমার সমব্যথী আছে, হয়তো তাকে আমরা খুঁজে পাই না, হয়তোবা চিনতে পারি না। কিন্তু তুমি খোলা আকাশের নিচে এসে দেখবে চারদিকের আলোয় আলোয় স্পন্দমান হচ্ছে তোমার জন্যে অনাবিল শান্তি, মুক্তির আনন্দধারা। তুমি যদি তা তোমার মধ্যে ধারণ করতে পার বদ্ধঘরের মধ্যে গিয়েও আকাশকে খুঁজে পাবে। তখন দূরে কোথাও শুকতারা নিভে গেলেও তোমার অনুভবের প্রান্তসীমায় তুমি শোক অনুভব করবে, তখন হয়তোবা তুমি গভীর ঘুমে, কিন্তু শিউলি ফুল ঝরে পড়ার নিস্তব্ধতাও তোমার ঘুমের মধ্যে স্পন্দিত হবে। বলতে বলতে বাবা সেই ঝরে পড়া ফুলগুলো রাস্তা থেকে সরিয়ে রেখে আমাদের জন্যে পায়ে চলার সরু পথ তৈরি করল।

আরেকদিন বাবা বলল,

যদি তোমার পেছন দিক দুর্বল হয় দেখবে সামনের দিকে হাঁটতে তোমার কষ্ট হবে। দেখবে তুমি ঠিকঠাক পা ফেলতে পারছ না। কোনও দিকে ঝুঁকতে তোমার কষ্ট হচ্ছে।

কোনও দিন বাবা বলে,

দেখ মানুষের শক্তি কেমন! সে এমন সঙ্গীত তৈরি করতে পারে যার তরঙ্গ শুনেই তোমার মনে বৃষ্টি নামে, সে এমন বাক্য উচ্চারণ করে শোনার পরেই তোমার মনে দৃশ্যকল্প জেগে ওঠে। এমন হতে পারে কোনওদিন তুমি হয়তোবা খোঁড়া হয়ে গেছ কিংবা দিনের পর দিন কারাগারের অন্তরালে দিন কাটাচ্ছ,– কিন্তু তুমি চোখ খোলা রেখে চিন্তা করলেও হয়তোবা এই গ্রামের পথটাকে দেখতে পাবে। তোমার মনে হবে

তুমি সেই পথ দিয়ে আবারও হেঁটে যাচ্ছ। ঠিক এমনিভাবে, এমনিভাবে তোমার গায়ে শিশিরকণা ঝরে পড়ছে, ভোরের আলো তোমার মুখে উদ্ভাসিত হচ্ছে, মৃদু বাতাসে তোমার রাতের দুঃস্বপ্ন মুছে যাচ্ছে। তুমি জানো এসবই বিভ্রম আসলে, কিন্তু তোমার মনে হবে। তুমি সেই দৃশ্যকল্পের জগতে ঘুরতে ঘুরতে কাঁদবে এবং চোখ মুছবে, আবার কাঁদবে এবং চোখ মুছবে। কিন্তু দেখবে এই বিভ্রমের জন্যে তোমার কোনও গ্লানি হবে না। বরং এক অনাবিল আনন্দে তোমার মন ভরে উঠবে। আসলে আমরা এক-একটা স্মৃতি নির্মাণ করি সে স্মৃতিকে হত্যা করবার জন্যে, কিন্তু তা স্মৃতি-ঘরে জমা থাকে আর তোমার সামনে যাওয়ার গ্লানিকে ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে কখনও সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

আরেকদিন বাবা বলে,

হয় পরম সমর্পণ না হয় পরম একাকিত্ব এ যদি অর্জন করতে না পার তবে তুমি কালজয়ী দিক-নির্দেশক হতে পারবে না। আমাদের নবী আল্লাহর কাছে নিজেকে সপে দিয়েছিলেন, তার জন্যে যথাযোগ্য সম্মানও পেয়েছেন তিনি। আবার চিন্তা কর গৌতম বুদ্ধের কথা, তিনিও ধর্মপ্রচারক কিন্তু আদ্যোপান্ত নাস্তিক আর কি। তবুও তিনি তাঁর নিঃসঙ্গতা নিংড়ে নিংড়ে মানুষকে নির্বাণের পথ দেখিয়ে গেছেন । তুমি ধার্মিক না নাস্তিক, তুমি আশাবাদী না নিরাশাবাদী সেটা বড় ব্যাপার নয়, আসল কথা হলো তুমি একাগ্র হতে পারছ কি না। তোমার যে যন্ত্রণা সে যন্ত্রণাকে হাজার জনের যন্ত্রণার সঙ্গে এক করে ফেলতে পারছ কি না। তা যদি পার দেখবে তোমার ব্যক্তিক আকাঙ্খা সমষ্টির চলার পথকে প্রশস্ত করছে, আর তুমি নিরাশাবাদী হলেও এক অন্ধকার পারাবারের যাত্রাপথে আলোকজ্জ্বল বাতিঘর হয়ে উঠেছ।

হাঁটতে হাঁটতে বাবা আমাকে অনেক কথা বলে। আমি তার কোনওটা বুঝি, কোনওটা বুঝতে পারি না। আমাদের পা শিশিরে ভিজে যেতে থাকে। স্যান্ডেলের মধ্যে মাটি ঢুকে গলে যায় শিশিরের আর্দ্রতাতে। আলপথের ওপর পা রেখে গলানো মাটি মুছি আমরা। এতসব কিছুর মধ্যে বাবার কথা বলা চলতেই থাকে। থামে না বাবা। আমি জানি না কেন বাবা এইসব বলত আমার কাছে। তাঁর তো জানাই ছিল এসব কথা আমি ঠিক বুঝতে পারব না। ধরতে পারব না। তবু বাবা বলে যেত। বোধহয় বাবা বুঝতে পেরেছিল আর কখনও আমাকে তাঁর আর এসব কথা বলার সময় হবে না, অন্য কোনও সময় এসব কথা বলার সময় হলেও আমার তা গ্রহণ করার মতো মন থাকবে না; অথবা হয়তোবা বাবা ছিল একজন ব্যর্থ মানুষ, ব্যর্থতার কথা তো কোনও

সমর্থ সুস্থ মানুষের কাছে বলা যায় না, উপহাসের পাত্র হতে হয়। বাবা তাই তার ব্যর্থতা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে অভিজ্ঞতার নির্যাস দিয়ে গেছে আমার কাছে। আরও পরে কলেজে পড়তে গিয়ে ভাড়া করা ওয়েস্টার্নের নেশায় মেতে বাবাকে মনে হয়েছে এরফানের মতো, যে পরম মমতায় শিশু কিংবা বালককে জীবনের নামতা পড়তে শিখাচ্ছে, যাতে কখনও একা হলে কখনও নিঃসঙ্গতা ধেয়ে এলেও সে অনায়াসে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে নিতে পারে।

বাবা বলত,

দেখবে হৃদয় যেরকম সম্পর্ক দাবি করে সমাজ সেরকম সম্পর্ক নাও চাইতে পারে। রাজনীতি যেরকম আচরণ প্রত্যাশা করে নৈতিকতার ধারণা সেরকম আচরণ অনুমোদন নাও করতে পারে। এ বড় জটিল কাজ দুয়ের মধ্যে মিলিয়ে চলা, হয় তোমাকে সমাজের সঙ্গে নিজের হৃদয় মিলিয়ে দিতে হবে, নয় আমৃত্যু তোমার হৃদয়বৃত্তির পক্ষে যেরকম সমাজ প্রত্যাশা কর তার জন্যে সংগ্রাম করে যেতে হবে। এর মাঝামাঝি কোনও পথ নেই। এর মাঝামাঝি পথে থাকে পলাতকেরা। তারা বিদ্রোহ করে না, বিদ্রোহীদের পূজা করে। আবার অন্যায়কারীদের সামনেও নত হয়ে থাকে।

সৎ-মা আসার পরে বাবার আরও অনেক র টিন পাল্টালেও এইটা কিন্তু পাল্টাল না। খুব ভোরে উঠলেও বাবা নামাজ পড়ত না। আমাদের দল আরও একটু ভারি হলো। মণীষাও আমাদের সঙ্গী হতো মাঝে মাঝে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে যত দূরই যেতাম না কেন দেখতাম রান্নাঘরে এই সাতসকালে কাজ করতে গিয়ে গনগনে চুলোর আগুনে মায়ের কপালে জমতে থাকা শিশিরই যেন ফুটে উঠেছে সকালবেলার ঘাসে ঘাসে, গাছের পাতায় পাতায়। হাঁটতে হাঁটতে হয়তোবা আমরা পৌঁছে যেতাম পায়রা নদীর পারে। নদী হয়তোবা ঘুমঘুম স্রোত নিয়ে একেবারেই নিথর, হয়তোবা অপেক্ষা করছে আসন্ন বর্ষায় জেগে উঠবার। বাবা মণীষার মাথায় একটু চুলবুলি কেটে কখনও বলে উঠত,

তোমার কি জানা আছে নদীর একই পানিতে মানুষ দুইবার ডুব দিতে পারে না, সাঁতরাতে পারে না?

অনেককিছুই জানতাম না আমরা দু'জন। দেখতাম সৎ-মা মণীষাকে স্তবক দিচ্ছে আসন্ন সংসারের, ভবিষ্যতের। সন্ধ্যার একটু আগে ও চালের তুষ আর খুঁদকুড়ো মাখিয়ে শেষবারের মতো মোরগমুরগী আর হাঁসগুলোকে টি-টি করতে করতে জড়ো করত। ওদেরও বোধহয় অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। মণীষা মুখের মধ্যে জিভ দিয়ে টি-টি আওয়াজ তোলার সঙ্গে সঙ্গে পড়িমরি করে ছুটে আসত কোত্থেকে সবগুলো মোরগ-মুরগী আর হাঁস-হাঁসা। মাটির ওপর ফেলে দেয়া খুঁদকুড়োর মণ্ডের জন্যে নিজেদের

মধ্যে মারামারি করত। কমজোরীরা সুযোগ পেত না শক্তিশালীগুলোর কাছে; কখন আবার শক্তিশালীগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারিতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ত যে কমজোরীরা আয়েশ করে দিনের শেষ খাওয়া খেয়ে নিত। যেদিন যেগুলো খেতে পেত না সেদিন সেগুলো মণীষার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করতে করতে আবারও খাওয়ার জন্যে ধর্ণা দিত। আর মণীষাও তা জানত বলে একটু মও লুকিয়ে রেখে দিত, সাধাসাধি করায় ছুঁড়ে দিত ওদের দিকে। তারপর ও হ্যারিকেনের চিমনিগুলোর কাচ ঘষে ঘষে ময়লা তুলে একেবারে ঝকঝকে করে ফেলত বাসী ছাই আর ন্যাকড়া দিয়ে। সেই ঝকঝকে হারিকেনের আলোয় আমরা পড়তে বসতাম ঘরের বারান্দায় পাটি পেতে। অথবা শীতের সকাল। মাদুর বিছিয়ে আমরা বসতাম খোলা উঠোনে। কিংবা গ্রীষ্মের ভোর। আমরা বসতাম ঘরটার পাশে কাঠাল গাছের নিচে। পড়তে পড়তে, বইয়ের গল্প শুনতে শুনতে কখনও-বা গল্পের রাজ্যে ঢুকে পড়তাম আমরা সবাই। বাবার বলা সেই গল্প, চুক আর গেক দুই ভাই। মনে হতো বাবা বাড়িতে না থাকাই ভাল ছিল। যদি সে থাকত সেই নীল পাহাড়ের কাছে বরফ পড়া বনটাতে! শীতে আমরা যেতাম মার সঙ্গে বাবার কাছে। বাবা বলতে থাকে, ধর তুমি চুক আর মণীষা তুমি গেক। না হয় মেয়েই হলে কিইবা আসে যায়! যাও তো ভাইয়ার জামাটা পরে আসো তো দেখি। শুনতে শুনতে আমরা চুক আর গেক হয়ে যাই। ডাক হরকরা চিঠি দিয়ে গেলে সোফায় চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকি আর গায়ের যত শক্তি সব জড়ো করে জুতোর গোড়ালি দিয়ে দেয়ালে তাল ঠুকতে থাকি। আমাদের পায়ের তালে তালে সোফার ওপরের ছবিগুলোও থরথর কেঁপে উঠবে, ঝনঝন করবে দেয়াল ঘড়ির স্প্রিংখানাও। আমি মহাউল্লাসে মণীষাকে দেখাতে থাকব, দেখ আমার এই চ্যাপটা টিনের কৌটোখানা। কত মহা দামী দামী জিনিস আছে তা কি তোর জানা আছে? আছে না কি তোর এরকম ট্যাঙ্ক, বিমান আর লাল ফৌজের ছবিওয়ালা চায়ের রাংতা আর চকলেটের মোড়ক। আছে না কি এইরকম কী সুন্দর কাকের পালক, চীনে তামাসা দেখানোর জন্যে ঘোড়ার গুচ্ছ চুল? মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিজের কৌটার প্রেমে পড়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একদিন ডাক হরকরা এসে যাবে। নিয়ে আসবে মায়ের নামে নতুন টেলিগ্রাম। আমি তা কৌটার মধ্যে রাখতে রাখতে খেয়াল করব মণীষা গান থামিয়ে কেন জানি জোরসে চিৎকার জুড়েছে, মার মার মার, ফতে! চাপানো দরজা খানিকটা খুলে দেখব ঘরের মধ্যে একটা চেয়ার টেনে সেটার পিঠে খবরের কাগজ ঝুলিয়ে একটা বর্শা দিয়ে সেটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একসা করে ফেলেছে মণীষাটা। এমনকি আমি মা'র জুতোর যে হলুদ বাক্সটায় টিনের বাঁশি, তিনটা রংচঙে ব্যাজ আর ছেচল্লিশটা কোপেক জমিয়ে রেখেছিলাম সেটাকে ভালুক বানিয়ে বর্শা দিয়ে অবিরাম খুঁচিয়ে চলেছে সে। দেখে নিশ্চয়ই মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে আমার, আমি ওর বর্শাটাকে নিশ্চয়ই ভেঙে ফেলব কেড়ে নিয়ে হাঁটুর ওপর ফেলে। আর মণীষাও মহা

ক্ষিপ্ত হয়ে আমার টিনের বাক্সটা কেড়ে নিয়ে লাফ দিয়ে জানালার ওপর উঠে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বাইরের বরফের মধ্যে। এইভাবে মায়ের কাছে বাবার আসা টেলিগ্রাম হারিয়ে যাবে; হারিয়ে যাবে বরফের স্তূপে চিরকালের ভবিতব্য নিয়ে।

কিংবা হবে এইরকম : আমি গড়ে তুলব তিমুরের দল। আর তুমি মণীষা হু হু তুমি জেনিয়া। ভীষণ দেমাগ তোমার বাবার মতো চেহারা বলে। তাও ভাল লাল ফ্রক পরে কেমন নির্ভয়ে খালি পায়ে তিনতলার ঝনকাঠে দাঁড়িয়ে মুছে ফেলতে পার জানালার ময়লা। যারা যাবে লাল ফৌজে যুদ্ধ করতে তাদের বাড়ির গেটে লাল তারকা একে দেব আমরা। তার মানে ওই বাড়ি এখন থেকে দেখভাল করব আমি আমার দলসমেত। ভোরের আলো ফোটার আগেই বাড়িগুলোর দরজার সামনে ফুলের গোছা পৌঁছে দেব আমরা। বুড়ি গয়লানীর যে ছেলে যুদ্ধে গেছে তার বদলে আমরা হব সেই গয়লানীর ছেলে। ফটক খুলে বুড়ি গয়লানী যাবে মাঠের পালের সঙ্গে তার গরুটাকে ভিড়িয়ে দিতে। আর সে ফিরে আসার আগেই আমরা ভরে ফেলব তার পানির পিপে। আর বুড়িটা ফিরে এসে তা দেখে হাউমাউ করে উঠবে কোনও কিছু বুঝতে না পেরে। ঠাকুমা বুড়িও দেখবে তার উঠোনে কেমন সুন্দর থাক থাক করে কাঠের স্তূপ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সোনালী চুলের পুতুল খেলা মেয়েটার বাবা যুদ্ধে মারা গেছে তো কি হয়েছে, আমরাই বানিয়ে দেব ওর দোলনাখানা। তারপর একদিন গেওর্গি যাবে ট্যাঙ্ক বাহিনীর উর্দি পরে মহাযুদ্ধের ডাকে। আর ওলগা গান গেয়ে উঠবে, 'বিমানচালক বৈমানিক!/ শূন্যগামী হে সৈনিক...' আর তুমি মণীষা হু হু তুমি জেনিয়া, কী ভীষণ পাজী,– একটু পানি খাওয়ার কথা বলে চুপ করে গিয়ে এক নম্বর সাধারণ জমায়েতের সঙ্কেত বাজিয়ে দেবে। ভারি চাকা ঘুরে উঠবে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে, দড়িতে পড়বে ঝাঁকি, লাগবে একটু টান, তিনবার পরপর বেজে একবার করে থেমে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো বাড়ির চালের ছাদে, চিলেকোঠায়, মোরগের খোপে একটানা বেজে উঠবে সঙ্কেত টিনের ক্যানেস্তারা আর ঝুমঝুমি। হৈ হৈ করে চলে আসবে সব ছেলেরা। গেওর্গিকে সামনে রেখে সবুজ পথ ধরে হেঁটে যাব আমরা। ওলগা বাজাবে এ্যাকর্ডিয়ন। আর এ্যাকর্ডিয়নের বাজনাকে সঙ্গতি দেবে আমাদের বোতল, টিনের ক্যানেস্তারা, কাচের বয়োম আর লাঠিসোটা। তারপর প্লাটফরমে আসবে লালফৌজ বোঝাই গাড়ি। আসবে সেনাদলের গাড়ি। আসবে ঘোড়ার পাল। কিংবা যাত্রীবাহী ট্রেন। তাতে করে চলে যাবে গেওর্গি আমাদের রেখে সত্যি সত্যি ট্যাঙ্ক বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করবে বলে। বাঁশি বাজবে। ট্রেন চলে যাবে। আর আমি জেনিয়ার দিকে তাকিয়ে বুকের লালতারকাটার দিকে তাকিয়ে সাথীদের সবার দিকে তাকিয়ে একা হওয়ার দুঃখ ভুলে যাব।

বাবার গল্প শুনতে শুনতে আমরা কল্পনার জগতে ভাসি। গল্প বলা শেষ করে বাবা একটু থামে, দম নেয়, বলে,

এইসব গল্প কে লিখেছে জান? আর্কাদি গাইদার। গাইদার শব্দের মানে জান? পথদেখিয়ে।

আমি আমার মানসচক্ষে দেখি গাইদার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সৈন্যদের এক দলকে। মূল দল থেকে বেশ অনেকটা সামনে হাঁটছে সে, তার কাজই তো তাই, আগে-আগে হাঁটা আর শত্রুপক্ষের কাউকে নজরে পড়লে ফিরে এসে খবর দেয়া, ফিরে আসার সময় না থাকলে যেখানে আছে সেখান থেকেই বিপদের আভাস দেয়া। মানুষটার নামের সঙ্গে কর্মেরও কি অদ্ভুত সম্পর্ক! পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে সে দেখল জার্মান হায়েনারা একেবারেই কাছাকাছি চলে এসেছে। এত কাছাকাছি যে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের আর খবর দেয়ারও কোনও সময় নেই। পথের মাঝামাঝি নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আমাদের গাইদার কিংবা চুক কিংবা গেক অথবা তিমুর। শূন্য আকাশের দিকে তাক করল পিস্তলটা। গুলি ছুড়ল অসীম শূন্যতায়। আর সে গুলির আওয়াজ পরিপূর্ণ করল শূন্যতাকে। বলশেভিকদের দলটা জার্মান বাহিনীর চোখে পড়ার আগেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিল। কিন্তু গাইদার আর ফিরে এল না। জার্মান বাহিনীর নিশানা তাকে লুফে নিল।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শিখি আমি এই দৃশ্যকল্পের মধ্যে দিয়ে। সামনের সবাই যেন শত্রু আমার, এখুনি হত্যার জন্যে সঙ্গীন তুলে ধরবে। কিন্তু পেছনের সবাই বন্ধু আমার, একদিন না একদিন তারা সামনের সবাইকে পরাজিত করে আমাদের স্বপ্নকে ঠিকই ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলবে। আমি তাদের থেকে অনেক আগে; যুক্ত হয়েও বিচ্ছিন্ন; মৃত্যুকে সর্বপ্রথম আলিঙ্গন করার স্বেচ্ছাপথ বেছে নিয়েছি আমি। পেছনের সবাইকে রক্ষা করার জন্যে, আরও অনেকদিন আমাদের সবার জন্যে ধোয়া ওড়া রোয়া-রোয়া ভাতের স্বপ্ন তাদের চোখে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এই পৃথক ও সম্মুখবর্তী নিঃসঙ্গ ও একাকী পথ হাঁটা আমার। সে পথ শেষ হবে কি না হবে তা জানি না আমি, আমি শুধু জানি হাঁটতে হবে।

আমি বড় হলাম হঠাৎ করে, মাত্র একরাতের অন্ধকারে। সেদিনও সন্ধ্যার পরে আঁক শেখার জন্যে মা আমাদের হারাধনের ছড়া শুনিয়েছে। হারাধনের দশটা ছেলে কি করে একে একে হারিয়ে গেল সেই বিয়োগান্তক ছড়া শোনার পরে আমরা দু'ভাইবোন আঙুলের কড় গুণে গুণে দেখেছি কি করে কমে যায় হারাধনের সন্তানেরা। হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়/ একটি কোথায় হারিয়ে গেল রইল বাকি নয়... শুনতে শুনতে আমার কষ্ট বাড়তে থাকে.. মা যখন বলে, হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ/ মনের দুঃখে বনে গেল রইল না তো কেউ, তখন আমি মুখ ঘুরিয়ে রাখি। রাতে সবাই শুয়ে পড়লে মণীষা আমাকে ফিসফিস করে বলে, চল আমরা কালকে বনে যাব,

হারাধনের ওই ছেলেটাকে খুঁজে বের করব। তখুনি খটখট কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনতে পাই আমরা। বুঝি না কে আবার এল এত রাতে এই প্রায়-বিরান মাঠের মধ্যে আমাদের বাড়িটাতে। আত্মীয়স্বজন তো খুব একটা নেই বোধহয় আমার বাবার, আর থাকলেও আসে না কোনওদিন। চাচা কিংবা মামা জাতীয় লোকজন কেমন কিংবা জীবনে তাদের ভূমিকাটাই বা কি তাও জানা হয় নি আমার। সাধারণভাবে পরিচিত কোনও মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষা থেকে এরকম আত্মীয়দের শুভেচ্ছাকে আলাদা ও বিশেষ বিবেচনা করার কোনও সুযোগ ছিল না আমার। সুযোগ থাকলেও বোধহয় এরকমই হতাম আমি। রাজাবাদশাদের ইতিহাস পড়তে গিয়ে এত বেশি পারিবারিক খুনোখুনি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর হিংসাদ্বেষ-এর কথা জেনে ফেলি আমি যে এখনও মনে হয় আত্মীয়স্বজন না থাকাই ভাল। দেখা যাবে একদিন সম্পত্তি দখলের মোহে সে না জানি কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে আছে। আমি তাই মণীষার বনে যাওয়ার প্রস্তাবটাকে তখন বেশ সিরিয়াসলি চিন্তা করছিলাম। হারাধনের ছেলে আমাদের ধারেকাছের কোনও বনে গিয়েই লুকিয়েছে নাকি আরও দূরে সুন্দরবনে চলে গিয়েছে, আবার সুন্দরবনে গেলেও সাতক্ষীরার দিক দিয়ে ঢুকেছে নাকি মোড়েলগঞ্জ অথবা পটুয়াখালী, বরিশালের দিক দিয়ে ঢুকেছে তা মার কাছে থেকে কাল জেনে নিতে হবে এইসব ভাবছিলাম শুয়ে শুয়ে। কড়া নাড়ার শব্দ আমার সে চিন্তায় ছেদ ঘটায় বলেই হয়তোবা আমি উৎসুক হয়ে উঠি কে এল এই অসময়ে তা জানবার ব্যাপারে। বাবা উঠে হারিকেনের সলতে উস্‌কে দেয়, ঘরের দরজা খোলে। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটে। কে এসেছে তা বুঝতে না পেরে আমার কৌতূহল আরও তীব্র হয়ে ওঠে। বাবা এবার ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে কিন্তু বেদম কথা কাটাকাটি হচ্ছে তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় শুয়ে থেকেও। আমি আরও অনুভব করি মণীষা তার হাত দিয়ে আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। আর মা বিছানায় উঠে বসেছে, শাড়ির কোনা শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে, যেনবা সেটা বিশাল কোনও অবলম্বন এই সময়ে।

অনেক পরে বাবা ফিরে আসে। আমি এবার অর্ধেক উঠে বসি, কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারি না, জিজ্ঞেস করে বসি বাবাকে,

বাবা, কে এসেছিল?

তুমি চিনতে পারবে না। ঘুমিয়ে পড়।

বাবা বলে বটে, আমার কৌতূহল তবু শেষ হয় না। মনে হয় বাবা কিছু চেপে গেল, কিন্তু মায়ের কাছে তো ঠিকই বলবে। আমি তাই চুপ করে শুয়ে থাকি কানটা খোলা রেখে। বিরাট এই ঘরটার মাঝামাঝি একটা নারকেলের মোটা দড়ি লাগিয়ে চাদর টানিয়ে ঘরটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এপাশের বড় খাটটায় আমি আর

মণীষা থাকি, ওপাশে বাবা আর মা। গভীর রাতে পৃথিবীও ঘুমায় বলে জেগে থাকলে ঠিকই শোনা যায় বাবা মা সাংসারিক কত গোপন বিষয় আলাপ করে। জাগতে জাগতে আমার চোখ ক্লান্ত হয়ে আসে, রাতের অন্ধকারকে নিজের কোটরে তুলে নিতে চায়, মণীষার একটা হাত ঘুমের মধ্যে ওর অগোচরে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আর চুলগুলো সব খাবি খেতে থাকে আমার থুতনি, মুখ, নাক, কান আর কপালের কাছে। অন্ধকারে দিয়াশলাই জ্বলে। বুঝি বাবা সিগারেট ধরাল। এবার কথা বলবে। তাঁর নিম্ন স্বর শোনা যায়,

ওরা আবার এসেছিল।

যতিচিহ্নবিহীন মুহূর্তও মায়ের উদগ্রীব হওয়াকে রোধ করতে পারে না। শুনি মা-ও বলছে,

কি বলল?

বলে এত জমিজমা আপনার– ব্যবসাও আছে, ২৫ হাজার টাকা কোনও ব্যাপার হলো? সাতদিনের মধ্যে যদি না দিতে পারেন তাহলে খবর আছে।

একটু থেমে আবারও বলে বাবা,

রাত বাহিনী আসলেই আমাকে ছাড়বে না তনু।

এই প্রথম আমি আমার বাবাকে মায়ের নাম বলতে শুনি, কিন্তু তা শ্রবণের উত্তেজনাকে অনায়াসেই হত্যা করে তাদের পরবর্তী কথাসমূহ। সেই প্রথম আমি রাত বাহিনীর কথা শুনি। আরও শুনি তারা বাবার কাছে চাঁদা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। বাবারও নাকি দু'চারজন পরিচিত বন্ধু আছে রাত বাহিনীতে। বাবা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারাই এসেছিল একটু আগে। কিন্তু কোনও লাভ নেই, চাঁদা দিতেই হবে, জানিয়ে গেছে তারা। মা-কে শুনি ক্ষীণ গলায় বলছে,

তুমি এতদিন হলো পার্টি করছ, মুক্তিযুদ্ধ করলে, এ থানার সবাই মানে তোমাকে,– রক্ষী বাহিনী কিছুই করবে না তোমার জন্যে?

বাবা রাতের অন্ধকারে তার হতাশ্বাসকে শুইয়ে রাখে,

হাতি পাঁকে পড়লে চামচিকাও লাথি মারে তনু। মোস্তফা ভাই তো অনেক আগে থেকেই আমার পিছে লেগে আছে। আর রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার কুত্তার বাচ্চাটা সব শুনে হাসতে হাসতে কি বলেছে জান? বলেছে, তো ওদের যদি ২৫ হাজার টাকা না দিতে চান আমাদের তো কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা দিতে হবে, না কি বলেন? আমাদেরও তো রিস্ক আছে। আপনাকে সবসময় প্রটেকশন দিতে হবে, রাতের বেলায়

আপনার বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় টহল রাখতে হবে, ওরা যদি ফাটুসফুটুস করে তাহলে দু'একজন তো মারাও যেতে পারে। লামছাম একটা কিছু না দিলে আমরাই বা প্রোটেকশন দেব কেন?

আমি পর্দার এপাশ থেকে অনেকক্ষণ শুধু জোনাকের আলোর মতো সিগারেটের আলোর আভাস দেখি। দেখি অন্ধকার কেমন করে গান গায় অস্থিরতার শরীর জুড়ে, কেমন করে তার সুর ছড়ায় বদ্ধ বাতাসের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে। বাবার আত্মমগ্ন কথা শুনি,

এদের দিয়ে মুজিব ভাই দেশ গড়বে? হবে না, কিচ্ছুই হবে না দেখ। মুজিব ভাই যদি মণি ভাইদের কথা না শুনে তাজ ভাইয়ের কথা শুনত, নিদেনপক্ষে দাদাভাইকে সাথে রাখতে পারত তাহলে কি আর এই দশা হয় আওয়ামী লীগের! কি কূটবুদ্ধিই না আছে মণি ভায়ের! যুদ্ধের সময় আমি হক ভাইদের লোকদের সাথে চুক্তি করলাম ঠিক আছে তোমরা তোমাদের মতো পাকবাহিনীকে হটাও, তোমাদের দখল করা জায়গায় আমরা আর পা বাড়াব না। তোমরাও আমাদের দখল করা জায়গায় পা বাড়াবে না। দেশকে তোমরাও ভালবাসা, আমরাও ভালবাসি। তোমাদের রাজনীতি একরকম, আমাদের আরেকরকম, তোমরা মুজিব ভাইকে লিডার মান না, কিন্তু দেশটাকে তো ভালবাস! চল সবাই আগে দেশটাকে স্বাধীন করি, তারপর জনগণই ঠিক করবে কে ক্ষমতায় থাকবে, জনগণই ঠিক করবে তোমাদের মতো গলা কেটে সমাজতন্ত্র কায়েম করা হবে না কি শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র কায়েম করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ যখন হয় তখন সবাই মিলেই যুদ্ধ করতে হয়। মাও সেতুঙও তো জাপানকে হটাতে চেয়ে তাই করেছিল, না কি করে নাই? আবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো তো সমাজতন্ত্রের পক্ষে ছিল না, কিন্তু যুদ্ধ করতে করতে বুঝতে পেরেছিল সমাজতন্ত্র ছাড়া স্বাধীন দেশের মানুষদের বাঁচানো যাবে না। বলা কি যায়, তাজ ভাইরাও তো একদিন ওই একইরকম কথা চিন্তা করতে পারে! এখন পাকবাহিনীকে হটিয়ে দেয়াই বড় কথা। তোমরা তোমাদের মতো হটাও, আমরা আমাদের মতো হটাব। তোমরা আমাদের দিকে অস্ত্র তাক কর না, আমরাও করব না। তবে হ্যাঁ, অপারেশন করার জন্যে যদি আমাদের বাহিনী তোমাদের মুক্ত এলাকার মধ্যে দিয়ে কোথাও যেতে চায় যেতে দিতে হবে। আমরাও তোমাদের যেতে দেব, দরকার হলে পেছন থেকে প্রটেকশনও দেব। সবকিছু ঠিকঠাক, ওরা খালি হাতে শুধু একটা বড় ম্যাপ নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এল কোন এলাকা দিয়ে কেমনভাবে যুদ্ধ করা হবে তার খসড়া আলাপ করার জন্যে আর মুজিববাহিনীর লোকজন সবাইকে ব্রাশফায়ার করে মেরে ফেলল! ওরা আর আমাদের বিশ্বাস করবে কেমন করে তুমিই বল!

বাবার আশাভঙ্গের অন্ধকার আমাদের ঘরের অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে। আর আমি শুনি বাবা বলছে,

মুজিব ভাই তাজ ভায়ের কোনও কথা শুনতে চায় না। মোশতাক ভাই যুদ্ধের সময়ে এত হারামীপণা করল তার সাথে গলায় গলায় ভাব আর তাজ ভাইকে একদিনও জিজ্ঞেস করলো না কেমন করে মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস পাড়ি দিল তাজ ভাই। উল্টে আরও হেনস্তা করতে চায় তাজ ভাইকে! তাজ ভাই এত গর্ব নিয়ে ঘোষণা দিল, যুদ্ধে ধ্বসে যাওয়া দেশটার জন্যে আমরা সবার কাছে থেকেই সাহায্য নেব, কিন্তু যে আমেরিকা আমার দেশের মানুষকে মারার জন্যে অষ্টম নৌবহর পাঠাতে পারে তার কোনও দান আমরা কখনও-ই নেব না; কই, মুজিব ভাই তো তার কথাকে একটু সম্মানও করল না। উল্টে আমেরিকার সাহায্য নিল। এত সম্মান করে মুজিব ভাইকে আমরা রাষ্ট্রপতি বানালাম, কোথায় উনি দেশে ফিরে জাতীয় সরকার বানিয়ে সব দলের ওপর ছড়ি ঘোরাবেন, তা না করে উনি পাওয়ার প্র্যাকটিস করার জন্যে নিজে রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে তাজ ভায়ের প্রধানমন্ত্রিত্ব কেড়ে নিলেন। তাজ ভাই ভাল মানুষ জন্যেই চুপচাপ এইসব সহ্য করে। কিন্তু আর কয়দিন? তাজ ভাই কিছু না করলেও ওই মোশতাক আর মণিই ডোবাবে মুজিব ভাইকে।

একটু চুপ থেকে আবারও বলে বাবা,

চাঁদা দিয়েও বাঁচা যাবে না। আবার চাঁদা চাইবে। রক্ষীদেরও চাঁদা দিলে আবার ঘুরে ঘুরে আসবে। এখন একটাই উপায় আছে বাঁচার : জাসদ করা।

বাবা যেন তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। কিন্তু সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেও তা কাজে লাগাতে মন ওঠে না। তাই চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকে। বাইরে বের হয় না। আমাদের সঙ্গেও কথা বলে না খুব একটা। ভোরে আমাদের জাগিয়ে দিয়ে বলে, যাও হেঁটে আসো। আমার শরীরটা যেন কেমন করছে, আমি আর বের হব না। কিন্তু বাবাকে ছাড়া আমাদের ভাইবোনের হাঁটতে খুব একটা ভাল লাগে না। তবু আমরা হাঁটতে হাঁটতে ফুল কুড়াই বাবাকে দিতে। আর ভোরের বাতাসে আমাদের অভিযোগ মেশা নিশ্বাস ফেলি অবিরাম। মাঝে মাঝে বর্গাদাররা আসে। বাবা তাদের সঙ্গে কথা বলে। সবচেয়ে বেশি সময় নিয়ে কথা বলে বর্গাদার আতাহারের সঙ্গে। সেদিন বিকেলেও অনেকক্ষণ কথা হয় দু'জনের। বাবা রাতে আমাদের আবারও গল্প বলে। এবার আর চুক-গেক নয়, তিমুরও নয়, অডিসিউসের ট্রয়ের যুদ্ধের জন্যে বাড়ি ত্যাগ করবার গল্প। আর পেনিলোপের প্রতীক্ষার গল্প। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অনেকদিন পরে জমকালো গল্প শুনি। শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়ে যায়। তখন বাবা বলে,

তোমরা এখন শুয়ে পড়তে পার। আমি এখন কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাব। তোমাদের একটু কষ্ট হবে। কিন্তু তবু যেতে হবে।

আমরা দেখি বাবা তার ব্যাগ আগেই গুছিয়ে রেখেছিল। বোধহয় শুধু এই গল্পটা বলে রাতটা একটু বাড়িয়ে নেয়াই বাকি ছিল। এবার সেটাও হয়ে গেল, এখন বেরিয়ে পড়ার পালা। আমরা দু'ভাইবোন কিছু বলতে পারি না। অবাক বিস্ময়ে একবার মাকে আরেকবার বাবাকে দেখি। মায়ের চোখেও কোনও অস্থিরতা দেখতে পাই না। বাবা ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে ঘরের দরজা খুলে বের হয় বাইরে। আমরাও বের হই পিছু পিছু। বাবা বলে, তোমাদের আসতে হবে না। বলে মা'র সাথে নিচুস্বরে কথা বলতে বলতে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। আমরা ভাইবোন পেছনে দাঁড়িয়ে থাকি। কোনও কথা বলতে পারি না, চোখের কোল বেয়ে একটু অশ্রুও গড়িয়ে পড়ে না। শুধু অনুভব করি মণীষা খুব শক্ত করে আমার হাতটা ধরে রেখেছে, ধীরে ধীরে হাতটা আরও শক্ত হয়ে উঠছে, যেন আমার হাতের আঙুলগুলোকে পিষে ফেলবে। পিষ্ট করতে করতে পিষ্ট হতে হতে আমরা এই অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত হই যে মানুষ এইভাবে হাতের বন্ধন তৈরি করেই তার মনের ওপর ঝাপিয়ে পড়া বাড়তি চাপকে মুক্ত করে। নিজের অজান্তেই আমিও মণীষার হাতটাকে শক্ত করে ধরে রাখি। আমরা কেউই জানতে পারি না এইভাবে আমরা পরস্পরের ওপর এক দুরপনেয় নির্ভরশীলতা তৈরি করি আজীবনের জন্যে আতণ্ড ভবিষ্যতের কোনও রেখার আঁকিবুকি ছাড়াই।

বাবাকে বিদায় দিয়ে মা ফিরে আসার পরেও আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। সামনে খাঁখাঁ প্রান্তর। আমি আজও জানি না কেন বাবা এই বিরান চড়ার মধ্যে এসে বাড়ি বানিয়েছিল। এ বাড়িতে সূর্যের আলো এসে পড়ে সরাসরি। আর তাতে বাড়ির চারপাশের গাছগুলোরই বেশি আনন্দিত হওয়ার কথা। বয়সে প্রাচীন কোনও গাছ নেই এখানে। আম জাম কিংবা কাঠাল গাছগুলোয় ফল দিলে কি হবে, স্পষ্টই বোঝা যায় সেগুলোর বয়স এত বেশি নয় যে অমুক দাদার কিংবা অমুক দাদির গাছ বলে ডাকা হবে। খানিকটা রাস্তা খেতের মধ্যে দিয়ে আলপথে হেঁটে গিয়ে তবেই না সড়কে উঠতে হয়। বর্ষা এলে বাড়িটাকে মনে হয় দ্বীপের মতো; একা একা জেগে আছে অথৈ জলরাশির মধ্যে কখনও কোনও রবিনসন ক্রুশো এসে বাড়িঘর বাঁধবে বলে। এইভাবে হঠাৎ বাবাকে রবিনসন ক্রুশো ভাবতে বেশ ভাল লাগে আমার। পরিবারের সবার থেকে আলাদা হবার পরে এমনকি পৈতৃক বাড়িতেও ঘর না তুলে বাবা বাড়ি করেছিল জনবসতি থেকে বেশ দূরে এই মাঠের ভেতর। একই সঙ্গে এ্যাডভেঞ্চারার্স আর অভিমানী মনে হয় বাবাকে আমার। প্রথমে যখন ঘর তোলা হয় সেবার কেমন ভয়াবহ শীত আর প্রচণ্ড গরম এই বাড়িটার ঘরের চালে নেমে এসেছিল তা কি আর আমি অনুভব করতে পারব! তবু সেসব ভাববার নেশা আমাকে পেয়ে বসে। কলাগাছ তো শো শো করে বাড়ে। বাবা কি ঘরের বেড়ার ধারে প্রথমে কলাগাছ লাগিয়েছিল? না কি বাঁশগাছ? কখনও তো শোনার কথা মনেও হয় নি আমার। আজ তবে কেন ইচ্ছা হচ্ছে শোনার, এই এখন বাবা এইভাবে চলে যাওয়ার পরে?

শুধু একবার বাবাকে প্রশ্ন করেছিলাম,

এইখানে তোমার একা থাকতে নিশ্চয়ই ভয় করত?

বাবা হেসে ফেলেছিল,

ভয় লাগবে কেন? তুমি খারাপ লাগার কথা বড় জোর বলতে পার। কিন্তু আমার তাও লাগে নি। তোমার মা তো সঙ্গে ছিল, সেই জন্যে। না থাকলেও খারাপ লাগত কি না বলতে পারি না। একা একা তুমি দূর আকাশের দিকে, ওপারের সবুজে চেয়ে আছ, হয়তোবা বইয়ের পাতায় চোখ বুলাচ্ছ না হয় গান শুনছ, খারাপ আর কি? রান্নাবান্না করার কথা ভাবছ? দেখ, মানুষের জীবনের রিক্ততা এইখানে,– সে প্রায়শঃ ভুলে যায় কাজের মধ্যে ডুবে থাকা আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চলার পথটা পূর্বপুরুষের মতোই খানিকটা পরিষ্কার করে রেখে যাওয়া হলো সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার। আর তোমার সৃজনশীলতা ঠিক করবে যে তুমি কতটুকু পথ কত সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করতে পারবে। অবশ্য অধিকাংশ মানুষই নতুন কোনও পথ তৈরি করতে পারে না, চলার পথ পরিষ্কার করে দিতে পারে না; ব্যবহৃত পথ চলতে চলতেই ক্লান্ত হয়ে ফুরিয়ে যায় তারা। এমনকি যে প্রকৃতি তাকে ব্যবহৃত পথে চলার জ্ঞান দিল তাকেও ধন্যবাদ দিতে পারে না। প্রকৃতির কাছে থেকে তুমি কত কিছু নিচ্ছ; প্রকৃতি কিন্তু চায় তার বিনিময়ে তুমি তাকে খানিকটা সময় দেবে, তার দিকে একটু সময় চেয়ে থাকবে, স্তব্ধতার ভাষায় কথা বলবে। নয়তো দেখবে তোমার সৃজনশীলতা ভোঁতা হয়ে গেছে, সঙ্গীতের সুর কর্কশ হয়ে গেছে, ভাষার চৈতন্য হারিয়ে গেছে। এমনকি তোমার শ্রবণের শক্তি উধাও হয়ে গেছে, বোধগম্যতার পরিধি সংকীর্ণ হয়ে গেছে, শ্রুতির মন্দ্রমুখরতা বিলোপ হয়ে গেছে।

আমি রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিকে সময় দিতে থাকি। আমার প্রকৃতিতে এখন অন্ধ আকাশ, গাছের বোবা পাতা শিখছে খসখসিয়ে কথা বলা, বাতাসের নৈশকালীন চলাফেরা। আমি এসবের অন্তরীক্ষে কান পাতার চেষ্টা করি, শুনতে পাই প্রকৃতিতে নদী ভাঙনের সশব্দ প্রতিধ্বনি। কিন্তু না, নদী নয়,– সড়ক পেরিয়ে আলপথ ভেঙে কারা যেন এগিয়ে আসছে আমাদের বাড়ির দিকে। দিনের বেলা হলে এই পদধ্বনি একেবারেই শোনা যেত না। রাতে যে শুনতে পাচ্ছি তার কারণ পুরো গ্রাম ঘুমিয়ে গেছে আর আমিও প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি প্রকৃতিরই ভাষায়। লোকগুলো যে ঘাসের ডগা মাড়িয়ে আসে আমি তার অব্যক্ত বেদনার অংশীদার হতে থাকি, লোকগুলো আলপথের যে মৃত্তিকাতে ভর করে পায়ের চাপে আমি সে মৃত্তিকার মূক ও বধির সত্তার সঙ্গে মিশে যেতে থাকি। লোকগুলো যেন আমাকে খেয়ালই করে না, বাড়ির ঢালু বেয়ে বাইরের উঠোন পেরিয়ে সোজা ঘরের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়তে থাকে। কিন্তু দরজা তো খোলাই আছে, ভেতরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে মা আর

মণীষা। আমি তাই ঘুরে দাঁড়াই, হেঁটে গিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে উস্‌কে দেই হ্যারিকেনের শিখা। ততক্ষণে আমার দেখা হয়ে গেছে তাদের মুখোশ, কারও হাতে অস্ত্র, কারও রামদা। অস্ত্র দেখতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমার মনে পড়ে মুক্তিযুদ্ধ হওয়ার পরে এই বাড়ির ভেতর অস্ত্রশস্ত্র এখানে-সেখানে গড়াগড়ি দিত। একবার আমি একটা হাতবোমা জোরে ছুড়েও ছিলাম অনেকদূরে, কিন্তু সেটার স্প্লিন্টার খসানো হয় নি জন্যে হয় নি কিছুই। আরেকদিন একটা রাইফেল নিয়ে আমি একটা অলস বেড়ালের পেছনে তাড়া করেছিলাম, ভাগ্য ভাল ট্রিগার টেপা জানতাম না; তাছাড়া রাইফেলের ওজনেই শিশু-আমি কাত হয়ে গিয়েছিলাম, গুলি করা আর হয়ে ওঠে নি। এসব ঘটনার পরে আরও অনেক ব্যাপার মিলিয়ে অস্ত্রগুলো শুনেছিলাম বাবা জমা দিয়ে এসেছে। এখন আবারও অস্ত্র দেখে আমার নতুন কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না, যেন আমি জানতাম এরকমই হওয়ার কথা, এরকমই অস্ত্র হাতে কয়েকজন লোকের আসার কথা যারা মুখে এটে রাখবে গামছা ভাজ করে বানানো মুখোশ।

হারিকেনের আলো উস্‌কে দিয়ে আমি স্পষ্টকণ্ঠে বলি,

আসেন, ভেতরে এসে বসেন।

লোকগুলোর মধ্যে একজন ধমকে ওঠে,

বসার জন্যি আসি নি, ডাক দে শুয়ারের বাচ্চাডারে।

লোকটার ধমকের মধ্যে কি যেন ছিল, আমি থতমত খেতে থাকি। এবং তারপরও ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিতে থাকি লোকগুলোর আশা যে পূরণ হবে না তা জানিয়ে দিতে,

বাবা বাড়িতে নাই।

নেই মানে? হারামজাদা কনে গিয়েছে? - বলে লোকটা দু'হাতে আমার দু'কাধ চেপে ধরে শূন্যে তুলে আবারও ছেড়ে দেয় মেঝের ওপর। আমি আমার কোমরে, পাঁজরে এবং বুকের খাঁচায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করি এবং কিছুক্ষণ দম আটকে মেঝেতেই শুয়ে থাকি। মা আর মণীষা ধড়ফড় করে উঠে বসে এবং মুখোশ পরা মানুষজনকে দেখে বুঝতে চেষ্টা করে যে ঘটনাটা ঘুমের মধ্যে না কি বাস্তবেই ঘটছে। তারপর তারা হঠাৎ ঘুমের জগত থেকে বেরিয়ে এসে আতংকিত চোখেমুখে পেছাতে পেছাতে একেবারে ঘরের মাটির দেয়াল ঘেষে এমনভাবে দাঁড়ায় যে মনে হয় দেয়ালের সঙ্গে মিশে যাবে। লোকগুলো প্রায়-উচুঁ স্বরে বলেই চলে,

হারামজাদা! হারামজাদা চান্দা না দিয়ে যাবে কনে?

আমার আর ধারণা করে নিতে ভুল হয় না যে লোকগুলো রাত বাহিনীর। তাদের একজন রামদা দিয়ে ঘরের মধ্যের আলমিরাটার কাচ ভেঙে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা

করে। আরেকজন পানি রাখার সরাইটা ভেঙে ফেলে লাথি দিয়ে। বালিশের মধ্যে ছুরি চালিয়ে দেয় এক যুবক। এ বাড়িতে আসার পরে মায়ের একটা এমব্রয়ডারি করা রুমাল কাচবাধাই করে রাখা হয়েছিল ঘরের দেয়ালে পেরেক ঠুকে; সোৎসাহে সেটাকে ভেঙে ফেলে আরেক যুবক। এইভাবে তাদের ধ্বংসযজ্ঞ প্রসারিত হয় বাবার বইয়ের আলমারির দিকে। সেখানে গিয়ে রাত বাহিনীর একজন থমকে দাঁড়ায় এবং জ্ঞানের বিশাল সমুদ্রের সামনে খানিকক্ষণ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর নাক সিটকিয়ে বলে ওঠে,

উ-উ-উ, জ্ঞ্যানী হ'য়েছে!

আরেকজনও তা অবলোকন করে এবং আগেরজনকে বলে,

দেখ তো আমাগের পাঠচক্রের জন্যি কুনডা কুনডা নিয়ে যাওয়া যায়?

আগেরজন মনযোগ দিয়ে বইয়ের পুট দেখতে থাকে এবং অবশেষে মন্তব্য করে,

সব প্রতিক্রিয়াশীলদের বই। এইসব দিয়ে কুন কাজ হবে না। পোলাপানের মাথা আরো খারাব হয়ে যাবে।

অনন্তর তারা অযত্নে অবহেলায় এবং প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে বইগুলো উঠোনের ওপর ছুঁড়তে থাকে। সেগুলো এলোমেলো ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে জন্যে পা দিয়ে লাথি লাথি দিতে দিতে নিয়ে গিয়ে আবার একসঙ্গে জড়ো করতে থাকে। কখনও বা কোনও লাল রঙের বই দেখতে পেয়ে সেগুলো এককোনে সরিয়ে রাখে। আমার ভেতরে আমি কারও কান্না শুনতে পাই। কেবল প্রাইমারি স্কুলে পড়ি আমি। এইসব বইয়ের মধ্যে কি লেখা আছে তার কিছুই জানা নেই আমার। কিন্তু আমার মনে হতে থাকে বাবা কি পরম মমতায় এই বইগুলোর যত্ন নিত আর সময় পেলেই সেগুলো নিয়ে মনযোগ দিয়ে চোখ বুলাত। কিভাবে বাবা এই বাড়ি বানালো সে কাহিনী কখনও-ই বলে নি আমাদের কাছে, কিংবা এ-ও বলে নি চাচাদের সঙ্গে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে কতটুকু সম্পত্তি পেয়েছিল। আর বাদবাকি সম্পত্তিই বা সঞ্চয় করল কেমন করে। কিন্তু বাবা শুনিয়েছিল কি ভাবে এই বইগুলো ধীরে ধীরে সংগ্রহ করেছে সে। এখানে কয়েক ইউনিয়নের মধ্যে বইয়ের লাইব্রেরি একটাই আছে, আমাদের হাইস্কুলে। সেটাও গড়ে উঠেছিল এক হিন্দু জমিদারের বিশেষ আগ্রহে। এর বাইরে বাবার এই লাইব্রেরি, তাও অনেক পরের। বাবা আর আমি সময়ের ব্যবধানটুকু বাদ দিলে একই স্কুলের মানুষ বলা যায় অনায়াসে। স্কুলের লাইব্রেরিতে বাবার সবচেয়ে প্রিয় ছিল যে বইটা সেটা একেবারে মেরে দেয়ার সময় বাবা না কি ধরা পড়ে গিয়েছিল। তারপর সে কি অপমান! হেড মাস্টারের নির্দেশে এ্যাসেম্বলিতে সব ছাত্রের সামনে কান ধরে দশবার ওঠবস করতে হয়েছিল তাকে। তারপর আর কোনওদিন স্কুলের লাইব্রেরি থেকে বই

নিয়ে পড়ে নি বাবা। বৃত্তির টাকা দিয়ে, পুরানো খাতা জমিয়ে বিক্রি করে বিভিন্ন অভিনব উপায়ে বই কিনে নিজেই লাইব্রেরি বানাতে শুরু করেছিল। চার মাইল হেঁটে থানা শহরের বইয়ের দোকানে চলে যেত বাবা, কিংবা কোনওদিন সকালে উঠে বিনা টিকেটে চড়ে বসত রেলগাড়িতে। নামত কোনও জংশন স্টেশনে, কেননা সেখানে আছে নিরেট বইয়ের দোকান,– থানা শহরের বইপত্রের দোকানের মতো সেগুলো পাঠ্যপুস্তক দিয়ে ঠাসা নয়। আরও বড় হয়ে বাবা চেনে পুরানো বইয়ের দোকান। এইভাবে গড়ে ওঠে অজ পাড়াগাঁয়ে আমার বাবার লাইব্রেরি।

এই বইগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বাবার মমতাকে এই লোকগুলো কখনও-ই বুঝতে পারবে না। আর লোকগুলোকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি, আমি নিজেই কি বুঝতে পারব এই বইগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাবার কত মমতা! একেকটা বই কিনত বাবা আর নিশ্চয়ই বুকে জড়িয়ে ধরে বার বার ঘ্রাণ নিত সেটার। অথবা লুকিয়ে রাখত হারিয়ে যাবার আশংকায়। আমার মানসচোখে ছবি ভাসতে থাকে, হাইস্কুলে পড়া একটা ছেলে থানা শহর থেকে বই কিনে কখনও সড়কপথে কখনওবা আলপথে বাড়ি ফিরছে, কখনও সে কোনও গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ছে, সতৃষ্ণ নয়নে দেখছে বইয়ের মলাট, তারপর নিজের অজান্তেই পড়তে শুরু করেছে স্থানকালপাত্র ভুলে। কিংবা একটি ছেলে নামছে শহরের রেলস্টেশনে। সেখানে সে থাকতে চায় না, সেখানে সে আনন্দ করতে চায় না, চায় না সে শহরের সবচেয়ে ভাল হোটেলটার তরকারি, ডালপুরি কিংবা সিঙ্গারা খেতে, চায় না সিনেমা হলে আসা নতুন ছবি দেখতে। তার ইচ্ছা খুবই সামান্য,– রেলস্টেশনে যে বই ও পত্রপত্রিকার দোকান আছে সেখানে ভাল বই খুঁজে পাবে। সে সেই বই কিনে নিয়ে ফিরে যাবে নিজের গ্রামে। গাড়ি থেকে নামতে নামতে, হয়তোবা তখন সন্ধ্যাও নেমে এসেছে, একটু আঁধার দখল করে নিয়েছে খানিক আকাশ, তাকে এখন পা চালিয়ে ফিরতে হবে, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সে মৃদু উত্তেজনা অনুভব করবে কখন বাড়ি ফিরে নির্বিবাদে বইটা পড়ার সুযোগ পাবে, রাত পার করে দেবে বইয়ের পাতায় ডুবে গিয়ে। মানুষ নিজেকেই জানতে পারে না ভালোভাবে; আমিই বা কেমন করে হুবহু বলে দিতে পারব বাবার সেই দুর্লভ আনন্দ, মমতার বিশালতা!

আমি লোকগুলোকে বাধা দিতে পারি না। আমি যতটুকু বুঝি বাবার পীড়ন এরা তো ততটুকুও বুঝতে পারবে না। এদের আমি বিরত করব কেমন করে। আমি তাই দাঁড়িয়ে থাকি। দেখি দেব সাহিত্য কুটিরের কাঞ্চনজঙ্ঘা চলে গেল বাতিল বইয়ের দলে, দেখি রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, যোগীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন গিয়ে শামিল হল তাদের সঙ্গে এক কাতারে। প্রতিক্রিয়াশীল কি তার মোটামুটি চলনসই সংজ্ঞাও তখনও শেখা হয় নি আমার। কিন্তু লোকগুলোর কথা থেকে বুঝতে পারি সেটা খুবই খারাপ জিনিস

এবং এসব বই সেই গোত্রের। বইগুলো জড়ো করে লোকগুলো আগুন জ্বালায়। শুরু হয় ওদের বহ্নুৎসব। বইয়ের পাতার ভেতর লুকিয়ে থাকা শক্তি নিয়ে আগুনের শিখা স্পর্ধিত ভঙ্গিতে বার বার তাকাতে থাকে খোলা আকাশের দিকে। অন্ধকারের মধ্যে সে শিখার দিকে তাকিয়ে মনে হয় চকরাখালিরা খেত পাহারা দেয়ার জন্যে আগুন জ্বালিয়েছে গভীর রাতে। কিংবা সেরকম কোনও কিছু নয়, একদল শীতার্ত মানুষ নাড়া, খড়, গাছের শুকনো পাতা এইসব জোগাড় করে আলো জ্বেলেছে উষ্ণতার অনুসন্ধানে। আলোর শিখার ওপর তারা হাত মেলে ধরেছে গভীর আগ্রহে, দূরে সরে যাচ্ছে শিশির ও শীত দুই ভাইবোন।

অনেকদিন পরে আমার আবারও মনে হবে এই দিনের কথা। তখন কিন্তু সত্যি সত্যি শীত। আমি ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি পুরানো অভ্যাসে হাঁটতেই বেশি ভাল লাগে জন্যে। হঠাৎ একটা রিকশা ব্রেক কষে আমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যাবে। রিকশা থেকে লাফিয়ে মারিয়া নেমে আসবে, আর আমি কিছু বলার আগেই 'চল চল ডেসটিনি দেখব' বলে হিড় হিড় করে আমাকে টেনে রিকশাতে তুলে নেবে। ওর পরনের দিকে তাকিয়ে জিনস দেখতে দেখতে আমার মনে হবে বিকেলের আকাশটা ধীরে ধীরে নেমে এসেছে মারিয়ার কোমর বেয়ে উরু পেরিয়ে হাঁটু দিয়ে পায়ের গোড়ালিতে। মারিয়া হাসবে এবং অকস্মাৎ আমার মনে হবে সে তার জিনসের সঙ্গে পরা শাদা জামাটাই ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে নিচ্ছে কি না। কিন্তু মারিয়ার শরীরের দিকে তাকাতেই আমি লজ্জা পাব এবং এত বড় একটা ভুল চিন্তা আমার মাথায় আসল কিভাবে তা ভেবে থৈ পাব না। মারিয়া ফিস ফিস করে বলবে, 'শোন ভালো গাঁজা পেয়েছি, সিনেমাটা দেখে পিজি-র পেছনে গিয়ে দুই ভাই কয়েকটা বারি মেরে আসব, না কি বল?' আমি কিছু বলতে পারব না, বস্তুত আমার বলবার তেমন কিছুই থাকবে না। মারিয়া যে এইরকম তা তো সবাই জানে, আমাকে যা ভাবিয়ে তুলবে তা হলো ওর মতো মেয়ের হঠাৎ আমার মতো ল্যালল্যালা ছেলের সঙ্গে এই রকম সুবোধ ব্যবহার। গাঁজা খেতেও আমার তেমন আপত্তি নেই, যদিও আমি তেমন টানতে পারি না এবং টানার ব্যাপারে আগ্রহও দেখাই না টাকাপয়সা না থাকাতে। গাঁজা খাওয়া বন্ধুরা এমনভাবে পাঁচ-দশ টাকা চেয়ে বসে যে আমার নিজেরই লজ্জা করে আর এই দুঃখে শাহবাগে আড্ডা মারাও অনেক আগেই বাদ দিয়েছি আমি। কিন্তু মারিয়ার কথা আলাদা, মেয়েমানুষ কেমন করে গাঁজা টানে আর টানবার পরে কথাই বা বলে কেমন করে, আচরণই বা কতটুকু সংযত থাকে এসব জানার অদম্য কৌতূহলে আমি ঠিকই রাজি হয়ে যাব গঞ্জিকা সেবনবিষয়ক প্রস্তাবনায়। তারপর মারিয়ার কাছে বলতে থাকব একটা ছোট্ট মফস্বল শহরের গল্প যেখানে শীত আসে পাতা ঝরিয়ে, রাত নামে খুব তাড়াতাড়ি, সুনসান রাস্তায় হঠাৎ দেখা মেলে পুলিশ কিংবা কোনও রাজনৈতিক কর্মীর; সেই শহরের দীর্ঘ পথে ভীষণ অন্ধকার, নিকষ কালো, আর তার মধ্যে তুমি হেঁটে যাচ্ছ একা

কিংবা কোনও বন্ধুসমেত। কেউ কোনও কথা বলছ না, বড়জোর একজন আরেকজনের হাত ধরে আছ। আরেক হাতে বিশুদ্ধ গঞ্জিকাভরা সিগারেট, আলো জ্বলছে অন্ধকারে মিটমিটিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে তোমরা চলেছ নদীপারের দিকে, সেখানে শীতল হাওয়া, অন্ধকারের বুকে কেবলই ছলাৎছল আর তোমরা হাঁটছ কেবলই সেই নদীর পারে, কোথায় কত দূরে কিচ্ছু জান না জানবার দরকারও নেই, তোমাদের ঠোঁটে শুধু জোনাক-আলো, মাথার মধ্যে সঙ্গীত বুনো বৃষ্টির,– গিয়েছ কখনও এমন ছোট শহরে?

মারিয়া আমার কথা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনে চলবে, ওর মুখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে বিকেল বেলায় নদীপারের বালুতে ভেসে ওঠা রোদের আল্পনা, চোখের অতলে জেগে উঠবে আকাশের ওপার আকাশ। তারপর যেন কোনও পাথুরে ঝরনার পাশে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে এরকম ফিসফিস কলধ্বনিতে বলে উঠবে,

আমাকে নিয়ে যাবে?

ও আমার জামার হাতা শক্ত করে চেপে ধরবে এবং আবারও ফিসফিসানো মুগ্ধতায় আহ্বান করবে,

বল তথাগত, আমাকে নিয়ে যাবে? আমরা সারা রাত জেগে থাকব, নদীর পার ধরে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যাব, যখন ভোরের আলো ফুটে উঠবে তখন দূরে আকাশের শুকতারা নিভে যাওয়া দেখতে দেখতে, পৃথিবীর প্রান্তরে সবুজ ঘাস জেগে ওঠা দেখতে দেখতে পারের বালিতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ব। বল নিয়ে যাবে?

আমি মাথা নাড়ি, হ্যাঁ নিয়ে যাব। কিন্তু আমি জানি মারিয়াকে নিয়ে আমার কোনওদিনও আমাদের শহরে বেড়াতে যাওয়া হবে না। কোনওদিন মারিয়া গেলেও আমি তাকে নিয়ে সারা রাত ঘুরতে পারব না, জাগতে পারব না, হাঁটতে পারব না; মানুষ কৌতূহল নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে, মানুষ আমাদের পিছু নেবে, মানুষ আমাদের উত্যক্ত করবে, মানুষ আমাদের নিয়ে কল্পকাহিনী ফাঁদবে; আমাদের বন্ধুরাও ইঙ্গিতময় হাসি দেবে, কিংবা তাদের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু হবে, তাদের কেউ হয়তো ফাঁক বুঝে মারিয়ার একান্ত সান্নিধ্যে বসে অন্তত একটা চুমু দেবার চেষ্টা করবে অথবা এসব কিছু না বলে এমন ভদ্র সংযত ও মার্জিত আচরণ করবে যেন মনে হবে মারিয়া আমার বিশেষ কিছু, আর কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হবে এবং আমরা এসেছি প্রাকবিবাহ রোমাঞ্চ নিতে,– অতএব আমাদের দু'জনকে যত বেশি একান্ত সময় কাটানোর জন্যে দেয়া যায় ততই ভাল এবং তারা আমাদের কাছাকাছি থাকলেও আমাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে। কিংবা রাতে আমাদের ঘিরে ধরবে একদল নৈশ পুলিশ। তারা হো হো করে হাসবে, তারা আমাকে বেধে ফেলবে, বাধতে গেলে বাধা দিলে মেরে ফেলবে, নদীতে ফেলে দেবে; আর বাধা না দিলে আমি দেখব মারিয়াকে ওরা একের পর একজন ধর্ষণ

করছে, মারিয়া আর কথা বলছে না পৃথিবীর সকল নিরবতা তার শরীরে যেন ভর করেছে, সে নিরবতায় শোনা যাচ্ছে একদল শ্বাপদের উল্লাস, উল্লাসধ্বনির মধ্যে দিয়ে মারিয়ার শরীর থেকে গড়ানো রক্ত নদীপারের বালি শুষে নিচ্ছে মারিয়ার লজ্জা আর ঘৃণা তার নিজের কাছে রেখে দিতে, তারপর একসময় মারিয়া মারা গেলে তাকেও ওরা নির্বিঘ্নে নদীতে ফেলে দেবে।

শুধু আমি কেন, মারিয়াই বা কেন, এ কথা তো সবাই জানে এই ধর্ষণগাথাই আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ গাথা। বলাৎকার করে নিজেদের রক্তকে প্রবহমান রেখেছে এদেশে আর্যসকল, তাদের পথ ধরে ধর্মানুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে ধর্মপ্রচারকেরা, সেই দো-আশলা নারীই আবার পছন্দনীয় হয়ে উঠেছে শাসক ইংরেজের বিদেশবিভুঁইয়ের নিরামিশী জীবনে, তারপর শুদ্ধচারী মুসলমান বানানোর জন্যে আমাদের ধর্ষণ করে গেছে পাকিস্তানী হায়েনারা; আর বছরের পর বছর ধরে চোখের সামনে দেখতে দেখতে এখন সেই ধর্ষণ আমাদের এত বেশি মজ্জাগত হয়ে গেছে, এত বেশি অনুশীলন ও চর্চার বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে আমরা অনায়াসে ধর্ষণে মত্ত হতে পারি, ধর্ষণের শততম ঘটনা উদ্‌যাপন করতে পারি, তারপর নির্বিবাদে সরকারের তত্ত্বাবধানে চলে যেতে পারি আমেরিকার মতো দেশে। দেশের সবচেয়ে সম্মানী কবি তখন কলাম লিখবেন যে এরকম লোক তো সরকারি দলে থাকবার কথা নয়, আসলে সে বর্ণচোরা, সরকারি দলে ঠাঁই নিয়েছে বিরোধী দল থেকে এসে; কিন্তু তিনি বলবেন না সরকারি দলে থাকা তার মামার কথা, যে মামা পরম মমতায় ধর্ষক ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে আমেরিকাতে। কিংবা তিনি বলতে ইতস্তত করবেন বস্ত্রহরণকারীদের পরিচয় উচ্চারণ করতে; সারা জীবন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের শৈল্পিক বর্ণনা পঠনে অভ্যস্ত তিনি এবং তাঁর মতো সংস্কৃতিসেবী বুদ্ধিজীবীরা বরং একটু পুলকই অনুভব করবেন। তবু হাজার হলেও কবি মানুষ; একসময় নিজের অজান্তেই বলে উঠবেন, ধর্ষণকারীদের চিড়িয়াখানায় রেখে দেয়া উচিত। ধর্ষণের এই স্তূপ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকবে। আমি ভয় পাব মারিয়াকে একা একা অমন মফস্বলে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমার ভীষণ খারাপ লাগবে মারিয়ার কাছে এই ভয় পাওয়ার কথা বলতে। আমি প্রত্যাশা করব সত্যি সত্যি মারিয়াকে নিয়ে যাওয়ার। আমি বলব, হ্যাঁ মারিয়া, তোমাকে নিয়ে যাব। আর 'ওহ্ গ্রেট তথাগত' বলে মারিয়া আমার দু'হাত চেপে ধরবে। আমি কি করব কি বলব ঠিক করার আগেই দেখব আমাদের রিকশা গন্তব্যে পৌঁছে গেছে।

তারপর সিনেমা শুরু হলে একেবারে প্রথমেই পর্দায় আরিস্ততলের চিন্তাধারার ওপর দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ আভারসের লেখা বই অনুবাদ করার দায়ে খ্রিস্টান লেখককে আগুনে পুড়িয়ে মারা হলে আমি চমকে উঠব, আমি দেখব

লেখকের সারা শরীর গ্রাস করে নিচ্ছে আগুনের শিখা, তারপর একসময় মুখকে ঘিরেও লকলকিয়ে উঠল সেই আগুন। আবারও আমি দেখব বহ্নুৎসব, দেখব কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ কিভাবে পুড়িয়ে দিচ্ছে আভারসের সমস্ত বই, আর আভারস নিজেও অবশিষ্ট বইখানা নিয়ে আগুনের মধ্যে ছুড়ে দেবেন, তখন আগুনের শিখা ছাড়িয়ে পর্দায় ভেসে উঠবে এক অলঙ্ঘনীয় অমর বাণী: চিন্তার রয়েছে উড়বার মতো পাখা, কোনও প্রতিবন্ধকতাই পারে না তার ওড়া ঠেকাতে। আমার অনেকদিন পর বাবার কথা মনে হবে, আগুনে পোড়ানো বইয়ের কথা মনে হবে, পোড়া ছাইগুলো পরদিন একসঙ্গে জড়ো করে মণীষা যে যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছিল সেকথা মনে হবে; আর মনে হবে বলেই আমি আরও নিবিষ্ট হয়ে মারিয়ার সঙ্গে বসে বসে গাঁজা টানব শাহবাগের অন্ধকারে।

গাঁজার শাদাটে ধোঁয়ার ভবিতব্যে একাকার হয়ে অকস্মাৎ ধেয়ে আসতে থাকে রাত বাহিনীর বহ্নুৎসবের আগ্রাসী ধোঁয়া। রাত বাহিনীর লোকগুলো হো হো করে হাসতে থাকে। আমরা আতংকিত হই বইয়ের স্তূপে লাগানো আগুন ঘরের বেড়া ও চালের দিকে এগিয়ে আসবে কি না। আমাদের আতংকের মধ্যে রেখে চলে যায় রাত বাহিনী। যাবার আগে আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়, এবার বাবার দেখা পেলে কোনও কথা নেই গুলি করে মেরে ফেলবে, শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে কোনও আপোষ করবে না তারা। আমি সংশয়ে পড়ি, যদি শ্রেণীশত্রু বলে মেরেই ফেলবে তবে আর চাঁদার জন্যে এতদিন চাপাচাপি করল কেন। সংশয় নিয়ে আমরা বসে বসে বই পোড়ার দৃশ্য দেখি। আমাদের আর ঘুম আসে না। কিংবা আসে, আমরা তা বুঝতে পারি না, আমি দেখি মণীষা মায়ের হাতের ডানায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেছে, আমি দেখি মা বারান্দার বাঁশের খুঁটিতে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে আছে। তারপরই আবার আমি চোখ খুলে দেখি মা আর মণীষা ভোরের ফর্সা আকাশের দিকে চেয়ে আছে, আমিও চেয়ে আছি না-ওঠা সূর্যের ছড়িয়ে পড়া আলোর দিকে। এর মাঝের সবটুকু সময়ই দৃশ্যান্তরে চলে গেছে, বইয়ের পাতাগুলো পুড়ে যাওয়ার পরেও এখনও ভেঙে যায় নি, কালো বাকানো শরীর নিয়ে তারা শুকনো পাতার মতো কখনও কখনও নড়াচড়া করছে।

সেই সকালেই রক্ষী আসে। তাদের মুখে বাকানো হাসি, চোখে বিদ্রুপ, শরীরে অশ্লীলতা। পৃথিবীর যাবতীয় শব্দ মিইয়ে দিতে অভ্যস্ত মৃত্তিকার কোমলতাও বাধ্য হয় রক্ষী আসার আগেই বুটের মচমচে আওয়াজ অতিশ্রবণ না করে আমাদের তাদের আগমণ বার্তা দিতে। উঠোনে এসে থামে তারা। বরাবরের মতোই তাদের কাছে থাকা অস্ত্রগুলোর দিকে প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকি আমি। তখনও উঠোন থেকে পোড়ানো বইয়ের ছাই সরানো হয় নি। রক্ষীরা শুকনো পাতার মতো পুড়ে যাওয়া বইয়ের পাতাগুলো বুট দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে, ভাঙতে ভাঙতে সাবধানে চারপাশ

দেখতে থাকে। তাদের শরীরের মধ্যে পা ফেলবার ভঙ্গির মধ্যে এমন সতর্কতা খেলা করে যেন রাত বাহিনী এখনও চলে যায় নি, আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে, এখনই তাদের সঙ্গে রক্ষী বাহিনীর যুদ্ধ হবে। হঠাৎ মণীষা ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠে,

বইয়ের ওপর দিয়ে হাঁটছেন কেন?

দু'তিনজন রক্ষী হেসে ফেলে,

বা-ব্বাঃ গলার ধার দেখিছ! আরে ছেড়ি এগুলি তো পুড়ে গিয়েছে।

পুড়ে গেছে তো কি হয়েছে? উঠানে আরও জায়গা আছে, সেখান দিয়ে হাঁটেন।

মণীষার কণ্ঠ আমাদের জাগিয়ে তোলে। আমি কিংবা আমার মা চোখে একটুও পলক না ফেলে রক্ষীদের দিকে চেয়ে থাকি, দেখি কি করে ওরা। একটু এদিক সেদিক চেয়ে রক্ষীর দল মায়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে,

কুন সুমায়, আয়েছিল কুন সুমায়?

মা চোখ নামায় না। তাকিয়ে থাকে, তার সারা রাতের জমানো ক্রোধ এবার কঠিন শব্দ হয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে,

কেন, রাতে কখন আকাশে আগুনের ধোঁয়া দেখা গেছে দেখেন নাই আপনারা? কোন দিকে আগুন জ্বলেছে তা ঠাহর করতে না পারেন সময়টাও কি ঠাহর করতে পারেন নাই? যাওয়ার সময় শ্লোগান দিয়ে গেছে, গুলি করেছে, সেসবও কি শুনতে পান নাই?

রক্ষীরা একটুও লজ্জা পায় না মায়ের কথায়। বলে,

ভাবী আপনি এমনি এমনি রাগ কইরছেন। কুন সুমায় কনে ডিউটি দেয়া লাগে আমাগের তার ঠিক আছে না কি? ভাইজানরে তখনই বলিলাম টাকা তো খরচ হবেই, আমাগের পিছনেও কিছু খরচ করেন, তা কানে তুইললো না। আমরাও কমান্ডার সায়েবের কাছে জোর গলায় কতি পারলাম না। তা একবার যেখন পিছু নিছে, আর কি আর ছাড়ি দিবে? ভাইজানকে ক'য়েন আ'লেই দেখা কইরতে। একটা না একটা উপায় তো বা'র করতি হবে। কনে গিয়েছে ভাইজান?

জানি না। কাল সন্ধ্যায় বের হয়ে গেছে। কিছু বলে যায় নাই।

একজন রক্ষী মুচকি হাসে,

রাতে যে আইবে টের পা'ছিল মনে লাগে?

মা আর কিছু বলে না। মনে হয় তার কোনও কিছু বলার আর প্রবৃত্তি হয় না। রক্ষীরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর 'ঠিক আছে আসলেই দেখা করতে বইলেন'

বলে আবারও চলে যায় বুটের মচমচ আওয়াজ তুলে। সকাল হয়েছে বলে দূরে দু'চারজন করে লোকের দেখা পাওয়া যায়, আসছে আমাদের বাড়ির দিকে রাতে দেখা আগুনের রহস্যকাহিনী জানবে বলে। মা তাই দ্রুত ক্ষিপ্রবেগে ভাঙা কাচ জড়ো করে সরিয়ে ফেলে, মেঝে ঝাড়ু দিয়ে ফেলে আর মণীষাকে দেখি পুড়ে যাওয়া বইয়ের ছাই জড়ো করতে।

বিকেল পার হয় না, তার আগেই রক্ষীরা আবার আসে। এবার তারা উদ্যত, রুক্ষ, চোখেমুখে লকলক করছে জিঘাংসা আর তীব্র ঘৃণা। আমাদের তার কারণ বুঝবার সুযোগই দেয় না তারা। আসার পথেই গরুকে পানি খাওয়ানোর বড় নান্দাটা লাথি দিয়ে ভেঙে ফেলে তারা। চিৎকার করতে থাকে,

কনে গিয়েছে হারামজাদা? শুয়ারের বাচ্চা জাসদে যোগ দিয়েছে? ভাবছে জাসদে যায়ে পার পাবে? অর জাসদ করা বা'র করব।

রাত বাহিনীর মতোই মহাতাণ্ডবে মেতে ওঠে রক্ষীর দল। থানে বাধা আমাদের নতুন ষাড়টাকে খুলে নেয় ক্যাম্পে নিয়ে যাবে বলে। তারপর আগুন জ্বালিয়ে দেয় খড়ের গাদায়। রাত বাহিনীর লোকদের তবু কষ্ট করে বইগুলো জড়ো করতে হয়েছিল পোড়ানোর জন্যে; খড়ের গাদায় আগুন দিতে রক্ষীদের সেটুকু কষ্টও করতে হয় না। মহাতৃপ্তি নিয়ে তারা আগুন জ্বলতে দেখে, ষাড়টা নিয়ে চলে যায় বীরদর্পে। যাবার আগে বলে যায়,

বলিস আবারও আসব আমরা। গরু খুলি নিয়ে যাব, হাসমুরগি ধরে নিয়ে যাব, আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাব। পারলে ওই জাসদের হারামজাদাগুলো যেন ঠেকায় আমাগের।

বহ্নুৎসব আর ধ্বংসের এই মহাযজ্ঞে আমরা নির্বাক হয়ে পড়ি। আর আমি এক রাত, মাত্র এক রাতের মধ্যে ভীষণ বড় হয়ে যাই, ভীষণরকম। একটু একটু করে চোখ মেলে দেখি, কেউ আর আমাদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। ভয় করে তারা যদি রক্ষীরা দেখে ফেলে, রাত বাহিনীর লোকেরা যদি ক্ষেপে ওঠে। দু'চারজন বর্গাদার লুকিয়ে মাঝেমধ্যে আসে, মায়ের সঙ্গে কথা বলে, কি বলে ভাল করে জানি না আমি আর মণীষা। মনে হয় তারাও বাবার মতো জাসদ করে। বাবা কবে আসবে, আদৌ আসবে কি না কিছুই জানা যায় না। স্কুলের ছেলেমেয়েরাও আমাদের সঙ্গে কথা বলে নিরস গলায়। আগে স্যার মাঝেমধ্যেই আমাদের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত, এখন আর কোনও কথা বলে না। কোনও কোনও মাস্টার আবার এমনি এমনি খুঁত ধরে খুব করে বেত মারে আমাদের ভাইবোনকে। আমাদের হাতের তালুতে, হাতের ডানায়, পিঠের ওপর, পাঁজর ঘেষে লাল দাগ পড়ে যায়। মা সরিষার তেল গরম করে সেঁক দেয়

শোয়ার আগে। ঘুমের ঘোরে জ্বর আসে, জ্বর এলে মণীষা কাতরাতে থাকে, কখনও ভয়ে চিৎকার করে আমাদের জড়িয়ে ধরে। আমি আমার বুকের মধ্যে মণীষার জ্বরতপ্ত গরম নিশ্বাস অনুভব করি। আমার সারা শরীর জ্বলতে থাকে, কিন্তু কি করব ঠিক করতে পারি না। রাত জেগে পালা করে আমি আর মা মণীষাকে জলপট্টি করি। কখনও মণীষা চোখ মেলে, বড় বড় মণি মেলে তাকিয়ে থাকে, আমাদের চিনতে পারে না, দু'হাত তুলে কি যেন খোঁজে, জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে চারপাশের গন্ধ শোঁকে। ঘ্রাণ শুকে মণীষা বুঝতে পারে কাছে আমি বসে আছি, পাশে মা ঘুমিয়ে আছে, হাত বাড়িয়ে আমাদের গা ছুঁয়ে মণীষা আমার অস্তিত্ব টের পেয়ে আবার চোখ বোজে নিশ্চিন্তে।

এইভাবে প্রতিদিন আমরা ভাইবোন আরও বেশি-বেশি করে কাছে আসি, প্রাত্যহিকতার মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলি নির্ভরশীলতার অব্যক্ত জগত। আমরা আর ভোরে হাঁটতে বেরুই না। ভয় এসে আমাদের ঘুমকাতুরে করে তোলে। মনে হয় বাবার কথা। কোনও কোনও দিন সকাল অসহ্য হয়ে ওঠে। তখন আমরা ভাইবোন মিলে বিলের ধারে গিয়ে দেখি পানিপোকা কি করে দৌড়ে বেড়ায় অথবা গোল্লাছুট খেলে পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে। কিংবা দেখি পাড়ের হিজল গাছের ডাল কেমন করে হেলে আছে বিলের মধ্যিখানে, হিজলের ফুল ঝরে পড়ছে পানির বুকে, তারপর জলজ ফুলের বেশে জলরাশিকে প্রসন্ন করে তুলছে, গাছ গাছের পাতা কিংবা ডাল সব্বাইকে যাই বলে ধীরে ধীরে অনন্তের প্রান্তরে ভেসে যাচ্ছে। হিজল ফুলের কান্না ধুয়ে যাচ্ছে মুছে যাচ্ছে বিলের জলে। কোনওদিন আমরা কেবল আকাশ দেখি। আকাশ দেখি আর পেটের মধ্যে চিনচিনে ক্ষুধা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করি। কেউ আমাদের বলে দেয় নি, এমন নয় আমাদের মা-ও চলে গেছে, কিন্তু নিজেরাই আমরা বুঝে গেছি তিনবেলা দূরে থাক একবেলা খাওয়া জোটানোটাই মায়ের কাছে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। মা তার বিয়ের শাড়ি পরতে শুরু করেছে। আমি বাবার ঢলঢলে জামাটা গায়ে চাপাতে শুরু করেছি নির্বিকার ভঙ্গীতে। মণীষাকে নিয়েই একটু সমস্যা। মায়ের কিংবা বাবা কারোরই কোনও কিছু ওর গায়ে লাগছে না।

প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন ঘটনা ঘটে। একেকদিন একেক ভিখারিণী ভিক্ষা করতে এসে একেক খবর জানায়। গ্রামের হাইস্কুলে সবচেয়ে ভালো ফুটবল খেলে মোকাররম ভাই। আমরা মুগ্ধ হয়ে বল নিয়ে তার দৌড়ে বেড়ানো দেখি। মোকাররম ভাইয়ের চুল বড় বড়। যখন বল নিয়ে দৌড়ায় তখন তার বাবড়ি চুল বাতাস কাটিয়ে দুলতে থাকে। আমরা ভেতরে ভেতরে ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরি। সেই মোকাররম ভাইয়ের বাবড়ি চুলে বিভ্রান্ত হয়ে একদিন রক্ষী বাহিনীর লোকেরা তাকে ধাওয়া করে। মোকাররম ভাই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় সড়কের

ওপর হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ে। রক্ষীরা তাকে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মারতে থাকে। নিয়ম না কি এইরকমই, অল্প অল্প মার দিয়ে দেখতে হয় মুখ খোলে কি না, খুললে ভাল, না খুললে ধারা অনুযায়ী একটার পর একটা দাওয়াই দেয় তারা। মোকাররম ভাইকে দৌড়ে ধরতে হয়েছে জন্যে আগে থেকেই রুষ্ট ছিল ওরা; সেজন্যে প্রথমেই রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মারতে থাকে।

মোকাররম ভাই কবুল করে ওইভাবে দৌড়ানো তার ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু ততক্ষণে রক্ষীদের মনের মধ্যে সন্দেহ ঢুকে গেছে : নিশ্চয়ই ছেলেটা হয় রাত বাহিনীর নয় গণবাহিনীর। না হলে দৌড় দেবে কেন। স্কুলের হেড মাস্টার বাজার করে ফিরছিলেন তখন। তিনিই মোকাররম ভাইকে উদ্ধার করেন অনেক কসম কেটে আর সাক্ষীসাবুদ হাজির করে। রক্ষীরা একেবারে হাল ছাড়ে না, স্কুলের ছাত্র কেন এতবড় চুল রাখবে এরকম বায়নাক্কা করতে থাকে। তারপর নিজেদের ক্যাম্প থেকে গোফ ছাঁটবার ছোট কাঁচি নিয়ে এসে মোকাররম ভাইয়ের সাধের চুলগুলো কোনও নিয়মকানুন ছাড়াই এখানে এক খাবলা ওখানে আরেক খাবলা এইভাবে কেটে ফেলে। একদিন বাজার থেকে বিলাতি কুমড়ো কেনার পরে রক্ষীরা খেয়াল করে দেখে যে ভেতরে একটু পচে গেছে। তখন তারা বেয়নেট দিয়ে খোঁচা মেরে কুমড়োর পচা অংশটা তুলে যে বৃদ্ধ কুমড়া বিক্রি করছিল তাকে খাইয়ে দেয় গায়ের জোরে। এক দোকানদার খেয়াল করে নি যে বেতারে তখন খবর হচ্ছে আর খবরের মধ্যে শেখ মুজিবের ভাষণ দেয়ার কথা বলছে। বেচারা প্রস্রাব করতে যাবে জন্যে রেডিও বন্ধ করেছিল। কাছেই চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল রক্ষী বাহিনীর কয়েক সদস্য। শেখ মুজিবের কথা বলার সময় রেডিও বন্ধ করার অপরাধে দোকানদারটাকে ধরে উত্তমমধ্যম দিতে থাকে তারা। তাদের এই উত্তমমধ্যম পর্ব চলতেই থাকে বেচারা অজ্ঞান হওয়ার আগে পর্যন্ত। লোকের কথা আর কি বলব! একদিন আমি বাজারের গোডাউনের কাছ দিয়ে আসার সময় দাঁড়িয়ে থেকে পড়ছিলাম আলকাতরা দিয়ে রাত বাহিনীর সদস্যরা কি সব লিখে রেখেছে আর গণবাহিনীর লোকেরা যে পোস্টার লাগিয়েছে তাতেই বা কি লেখা আছে। হঠাৎ আমি আমার কানে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করি, তারপরই আমার কোনও হুশ থাকে না, অনেক পরে ঝিমঝিম মাথা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই আমার কোমরে আরেকটা লাথি পড়ে। আমি শুনি একজন রক্ষী বলছে, শুয়ারের বাচ্চারে আরও পিটাও। ও শালা ঠিকই জানে কোন সুমায় ওর ব্লাডি ফাদার আ'সে পোস্টার লাগিয়ে রা'খে গিয়েছে। আর ওগের আস্তানাই বা ক'নে। কিন্তু আমার মুখের একপাশ দিয়ে রক্ত গড়াতে থাকে এবং মাথা ঘুরতে ঘুরতে পড়ে যাই মাটির ওপর। এই অজ্ঞানতাই রক্ষা করে আমাকে। আমি জেগে উঠে দেখি পানের দোকানদার রমিজ ভাই এদিক সেদিক ভয়ে ভয়ে তাকাতে তাকাতে আমার মাথায় পান ভিজিয়ে রাখার পানি দিচ্ছে একটা পান তিনকোনা ভাঁজ করে।

এ ঘটনার পরে জনবহুল, রক্ষীলভ্য জায়গাগুলো এড়িয়ে চলতে শুরু করি আমি। আমার নতুন সময় কাটানোর জায়গা হয় সড়কের ধারে তোলা সোলায়মানের বাবার নতুন দোকান। আমি যে সেখানে পাত্তা পেতাম তা কিন্তু নয়। দোকানের সামনে পাতা বাঁশের চাঙারির কাছে হাবাগোবা মানুষের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম দিনদুনিয়ার নানা কিসিমের মানুষ, চুপচাপ বিজ্ঞাপন তরঙ্গের অনষ্ঠান শুনতাম সে দোকানের এক ব্যান্ডের রেডিওতে। সোলায়মানের বাবা কোনও কাজে বাজারে কিংবা খেতে গেলে অথবা প্রতি বৃহস্পতিবারে নতুন মাল আনার জন্যে থানার বাজারে গেলে সোলায়মানকে দোকানে বসিয়ে রেখে যেত। তখন আমি অনেক সাহস করে বাঁশের চাঙারির ওপরে গিয়ে বসতাম। প্রায় সমান বয়স হওয়াতে আমাদের মধ্যে একটুআধটু কথাও হতো। বেশির ভাগ সময়েই সোলায়মান মুখ গম্ভীর করে রাখত, তা এইভাবে তাকে বাবা না থাকায় দোকানদারী করতে হচ্ছে জন্যে না কি আমি বাঁশের মাচালের ওপর বসে রক্ষী বাহিনীর কোপানলে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছি জন্যে তা বোঝা যেত না। কখনও কখনও সোলায়মান কঠিন চোখে তাকাত আমার দিকে, যেন আমি চোখ দেয়াতে তার দোকানের বিক্রিবাট্টা কম হচ্ছে। আবার কখনও মুড ভাল থাকলে সিনেমার গল্প শোনাত,

এই যে রেডিওয় এখন ডাকু মনসুর সিনেমার গান হচ্ছে না? হেভি সুন্দর সিনেমা। আমার চাচা দেখে আয়েছে টাউনিরতে। এই সিনেমার যে ভিলেন আছে রাজু আহমেদ তাকে কয়দিন আগে সত্যি সত্যি মারে ফেলেছে। কেডা মারিছে জানিস?

কখনও সোলায়মান আমাকে একটা দুটো বনবনি কিংবা একদলা আখের কিংবা পাটালি গুড় দিয়ে বলতো, নে খা। বুভুক্ষ আমি তা হাতে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতাম। বাড়িতে আমি ফিরতে চাইতাম না খুব সহজে। জানতাম ফিরে গিয়ে খাওয়ার জন্যে যা কিছুই পাই না কেন তা আসলে মায়ের অভুক্ত থাকার উপসংহার। এমনকি মণীষাও শিখে গিয়েছিল এই বিদ্যা। খেতে ভাল লাগছে না বলে সে উঠে যেত থালার অর্ধেক শেষ না হতেই। ও-ও জেনে গিয়েছিল পুরোটা খেলে মা একেবারেই অভুক্ত থাকবে। আবার একেবারেই না খেলে মা কষ্ট পাবে কিংবা হুলস্থুল কোনও কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। আমি তাই বাড়িতে না থেকে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতাম এদিক সেদিক, আর দেখতাম চারপাশে কিসব ঘটনা ঘটছে অহরহ। একদিন হাটবারে চুপে চুপে বাজারে গিয়ে দেখি মহাকাণ্ড। কোনও দোকানে দিয়াশলাই পাওয়া যাচ্ছে না। রক্ষীর দল এসেছে এই সমস্যার সমাধান করতে। তারা প্রতিটা দোকানে গিয়ে দিয়াশলাইয়ের জন্যে দোকানঘরটাই তছনছ করে ফেলছে। ভাঙছে কাচের বয়োম, ফেলে দিচ্ছে জিরা, মশলা মরিচ, বিস্কুট-সিগারেটের প্যাকেট কিংবা টিনভর্তি নালি। এ সব করেও দিয়াশলাই না পাওয়াতে দোকানদারের হাত পেছন দিকে মুচড়ে নিয়ে যাচ্ছে মেছো বাজারের সামনের ফাঁকা জায়গায়। আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা

করছি কখন শুরু হবে মূলপর্ব : কালোবাজারি করার জন্যে দোকানদার ধোলাইপর্ব। একজন হাটুরে ফিসফিসিয়ে তার সঙ্গীর কানে কানে বলেই বসে,

চাইল ডাইল যহন মজুত করে তহন কুনু শালার দেখা পাওয়া যায় না। আর এগন নিজেদের সিগারেট খাওয়ার ম্যাচ খুঁজে না পায়ে মাতুব্বরি করছে। শালার পক্ষী বাহিনী!

একজন রক্ষী বাহিনী ঠিকই শুনে ফেলে তার এই সরস মন্তব্য। অনন্তর তাকেও বাধা হয় পিঠমোড়া করে। ধান ভাঙাবার যে কলটা আছে বাজারের উত্তর দিকে সেখান থেকে একমুঠো ধান নিয়ে আসার জন্যে হুকুম দেয় এক রক্ষী। কেউ একজন নিয়ে আসে তা এক মুহূর্তের মধ্যে। মন্তব্য করা লোকটাকে চিৎ করে ফেলে দেয়া হয় মাটির ওপর। তার নাভী অঞ্চলে ধানগুলো ঢেলে দেয় রক্ষী। তারপর সোজা দাঁড়িয়ে ডান পায়ের গোড়ালিটা নাভীর ওপর ঘোরাতে থাকে। লোকটা প্রচণ্ড আর্তচিৎকারে ফেটে পড়ে, চোখ দিয়ে আপনাআপনি পানি গড়িয়ে পড়ে, নাকের সামনের অংশ ভয়াবহ যন্ত্রণায় কেমন যেন ফুলে ফুলে ওঠে, একসময় চোখের মণি উল্টে উল্টে যেতে থাকে, কান্নার স্বর মৃদু হয়ে আসতে থাকে, অসুস্থ কিংবা পরিশ্রান্ত ঘোড়ার মুখ দিয়ে ঝরে পড়া ফেনিল পানি বেরিয়ে আসতে থাকে লোকটার নাকমুখের মধ্যে থেকে। রক্ষীটাও মনে হয় ক্লান্ত বোধ করে। দুই পায়ে ভর করে এবার সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর আরেকজনকে অর্ডার দেয় লবণের দোকান থেকে একমুঠো লবণ নিয়ে আসতে। আমি এবং হাটুরেসকল রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করি পরবর্তী ঘটনার জন্যে। সবাই কেনাবেচা বাদ দিয়ে মৃত্যুর মতো শীতল নিস্তব্ধতার মধ্যে বসতি গাড়ে ভবিষ্যতে আরও অভাবনীয় দৃশ্য দেখবে বলে। একজন হাটুরে লবণ নিয়ে আসে এবং এবার সেই রক্ষী তা খুবই যত্ন করে লোকটার নাভীর মধ্যে থেকে ধান সরিয়ে ক্ষতবিক্ষত নাভীমূলে স্থাপন করে। লোকটা এতক্ষণ ধরে সহ্য করা যন্ত্রণার ক্লান্তি ভুলে আবারও মরণ চিৎকার দিয়ে ওঠে। কিন্তু রক্ষীর দল নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে। একজন চিৎকার করে ঘোষণা দেয়,

আমাদের হুকুম ছাড়া যে শালা এই কুত্তাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে তারও একই অবস্থা হ'বে।

আমি আর অপেক্ষা করি না। মানুষজন ভীড় করে আছে, নিশ্চল হয়ে দেখছে মধ্যযুগীয় বিচারের দৃশ্য, আমি তাদের কোমর কিংবা উরুর ধাক্কা খেতে খেতে তাদের শরীরের ফাঁক-ফোকড় গলিয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকি। আমার মনে হয় রক্ষীরা পেছনে ধেয়ে আসছে আমাকেও ধরবে বলে। আমি তাই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে অনেক দূরের বটগাছের কাছে এসে হাফাতে থাকি।

সোলায়মানের চেয়েও আমার বেশি খাতির জমে ওঠে ঘাসুড়ে হালিম নানার সঙ্গে। একদিন কড়া রোদের দুপুরে যখন আমি সড়কের একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আশেপাশের কিংবা দূরের গাছগাছালিগুলো খেয়াল করছি আর ভাবছি কোনটাতে গিয়ে চড়লে একটা দু'টো ফল আমার না খাওয়া পেটে চালান করা যাবে, তখন দেখি সে দু'হাতে দু'টা খালি বাইক আর ধামা নিয়ে হনহন করে হেটে আসছে। আমি তার হাঁটার ভঙ্গি দেখতে দেখতে ক্ষুধার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু হালিম নানা আমার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়, আমাকে ভালো করে খেয়াল করে, তারপর জিজ্ঞেস করে,

তুমি মাস্টার সায়েবের ছেলে না?

জানি না কিসের জন্যে এরা সবাই আমার বাবাকে মাস্টার সাহেব বলে। তবে আমি এই সম্বোধনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাই শুধু ঘাড়টা নেড়ে সম্মতি জানাই। হালিম নানা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,

না খায়ে আছ?

ওইটুকু বয়স, কিন্তু আমি সম্মতি জানাতে দ্বিধা করি, দ্বিধা করি কেননা মাত্র একরাতের মধ্যেই আমার মনের বয়স বেড়ে গেছে, আমি বড় হয়ে গেছি, আমি জেনে গেছি মানুষ নির্বোধ ও জ্ঞানশূন্য অবস্থায় জন্ম নিলেও তাকে বহন করতে হয় তার পূর্বপুরুষের পরিচয়ের বোঝা, যাবতীয় সামাজিক ঋণ, লোকনিন্দা, পারিবারিক অবস্থানের সরল ও বক্র রেখা। কোন এক নিরীহ ভেড়া এসে নেকড়ের এই ঘাটের জল ঘোলা করে রেখে গেছে,– আমাকে তার দায় বইতে হবেই। আমি তাই কিছু বলি না, বরং হালিম নানাদের ব্যাপারে ভীষণ উন্নাসিক, এরকম ভঙ্গিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। নানা আবার বলে,

আ'সো, আমার সাথে আ'সো। আমারে চেন তুমি? তোমার বাপমা'র বিয়ার সুমায় আমাকে তোমার মা'র ধর্মবাপ হতি হইছিল। সেসব ঘটনা বুঝবে না তুমি। বড় হলি সব টের পাবা।

আমরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকি। কেন আমি তার পাশাপাশি হাঁটি? এই ক্ষীণ প্রত্যাশাতে সে আমার মায়ের ধর্মবাবা, অতএব আমাকে সামান্য হলেও কিছু একটা খাওয়াবে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে? এই ক্ষীণ প্রত্যাশাতে যে কোনও কিছু খেতে দিতে না পারলেও মানুষটা এমন একটা গল্প ফেঁদে বসবে যে আমি ক্ষুধার কথা ভুলে যাব? কিংবা এরকম কোনও ক্ষীণ আশাও কি আমার মনে লুকিয়ে থাকে যে আমি আমার বাবা মা অথবা সৎ-মা কারোরই অতীত তো জানি না তেমন, এই মানুষটা তার প্রবীণ অভিজ্ঞতায় এ বিষয়ে বলবে অনেক কিছুই? দুপুরের রোদ আমাকে পুড়িয়ে মারে, রোদের তাপে আমি আমার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলি। হালিম নানা হঠাৎ তার লুঙ্গির ট্যার

খুলে একটা আধখাওয়া মোটা পুরু রুটি বের করে। গমের ভুষি, ঘাসের বিচি আর চালের কুড়ো মেশানো মোটা রুটি, ভেতরে যতটুকু সম্ভব মরিচ দেয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে। তবে পেয়াজের বংশও নেই বলা যায় জোর গলাতেই। আমি সে রুটিই গোগ্রাসে গিলতে থাকি।

কিছুক্ষণ খাওয়ার পরে পেটের মধ্যে ক্ষুধার উগ্রতা নাকচ হয়ে গেলে আমি সম্বিৎ ফিরে পাই। হালিম নানা যে বার বার পেছন ফিরে আমার খাওয়া দেখছে এটা খেয়াল করে একটু লজ্জা পাই, লজ্জা পাই আরেকজনের আধখাওয়া জিনিস এভাবে খেয়ে ফেলায়। নিশ্চয়ই নানা এ রুটিটুকু দুপুরে খাওয়ার জন্যে রেখে দিয়েছিল! আমি যদি সবটুকু খেয়ে ফেলি তাহলে তাকে সারাদিন অভুক্ত থাকতে হবে। আমি তাই অবশিষ্ট রুটি বাড়িয়ে দেই নানার দিকে,

নিন, খান আপনি।

না রে বাজান, তুই খা। আমার তো তিনকাল যায়ে আর এক কাল বাকি আছে। খালিই কি আর না খালিই কি। মরে গেলিও তো ক্ষতি নেই।

বলেই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর আপন মনে আবারও বলে,

এমন বংশের এমন লোকের ছেলে, আর কপালের ফ্যারে আইজ কি অবস্থা!

আমরা দুজন পাশাপাশি হাঁটতে থাকি কোনও কথা না বাড়িয়ে। আর কিছুদিনের মধ্যেই বর্ষা এসে যাবে, সড়কের ধারের এই নালা পানিতে ভরে যাবে, মাঠ ডুবে যাবে। এমনও তো হতে পারে এই সড়কও ডুবে যাবে। আমি নানাকে প্রশ্ন করি,

কোথায় যান আপনি?

ঘাস খুঁজজি, ঘাস। ঘাস চেন? দুবলাঘাস, ভ্যাদলা ঘাস, চেঁচো ঘাস, ব্যাঙ থুবড়ি ঘাস?

আমি হেসে ফেলি, অনেকদিন পরে হেসে উঠি এবং অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে আমার মধ্যে এখনও কোথাও হাসির বন্যা লুকিয়ে আছে, এখনও মরে যায় নি। হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে না করি আমি। বলি,

ঘাস দিয়ে কি করবেন?

গরু খাওয়াতি হবি না? নিজে না হয় না খায়ে থাকলাম, অবুলা জানোয়ার, তারে তো খাওয়াতি হবি। না কি?

বলে হালিম নানাও রহস্যভরা হাসি হাসে। তারপর আমাকে ঘাস চেনায়। কোন ঘাস কখন খেতে দিতে হবে, কোন ঘাস খেলে কোন মৌসুমে কোন কোন অসুখ হবে সব বলে যেতে থাকে,

গরু-বাছুর সবচে বেশি পছন্দ করে কোন ঘাস জানো? শামা ঘাস। সব সুমায় পাওয়া যায় না। আউশ আর কুষ্টার খেতে হয়। উঁচো জমির আমন খেতেও পাওয়া যায়। গরু-বাছুর পালি খুপ খুশি হয়। আমন ধানের বিচেলিও খুপ পছন্দ করে। কুচি কুচি করে কাটে পানিতে ভিজিয়ে একটু খইল মিশিয়ে খাতি দেলি পাগলের মতো খায়। শীতির সুমায় দুতিনদিনকার পুরনো উলা রস মিশিয়ে খাতি দিলি শরীল খুপ ভাল থাকে।

আমি অবাক হয়ে শুনি। শুনতে শুনতে ভাবি বাবা ঠিকই বলেছে, সবকিছু বইয়ের পাতায় পাওয়া যায় না। অনেক কিছু শিখে নিতে হয় নিজেদের আশেপাশে থেকে, প্রতিদিনের চলাফেরা থেকে। নানার সঙ্গে পথ হাঁটতে হাঁটতে এইসব শুনতে শুনতে মনে পড়ে অনেক আগে বাবার সঙ্গে ভোরবেলা হাঁটার কথা, বাবার মুখ থেকে নানা কথা শোনার কথা। হালিম নানা হঠাৎ আমাকে আশ্বস্ত করে,

চিন্তা ক'রো না। বর্ষা আসলিই কচুরিপানা ভাসে আসবে। তহন আর গরু খাওয়ানোর জিনিস খুঁজতি হবে না।

তারপরেই যেন খুবই গোপনীয় কথা বলছে এমনভাবে আস্তে আস্তে বলে,

তবে খালি কচুরিপানা দিতি যায়ো না। তালি গরু ডায়রিয়া হয়ে মরে যাবে।

আমি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ি,

তার আর দরকার হবে না।

দরকার হবে না মানে?

আমি ম্লান হাসি,

আমাদের সব গরু বলদ আর ষাড় হয় রাত বাহিনী না হয় রক্ষী বাহিনী নিয়ে গেছে। খালি একটা বাছুর আছে। এরপর যেদিন আসবে হয়তো সেদিন এটাও নিয়ে যাবে।

হালিম নানা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, সান্ত্বনা দেয় আমাকে,

চিন্তা ক'রো না। তোমার বাপ ফিরে আসলি আবার তোমাগের গোয়াল গরু দিয়ে ভরে যাবে। তোমার বাবারে তো চিনি আমি। ভাঙ্গে কিন্তু মচকায় না। এরহম বহু

খারাপ সুমায় গ্যাছে তোমার বাবার। না খায়া থাকতি হয়েছে দিনির পর দিন। আবার সব গুছিয়ে নিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরে অবশিষ্ট বাছুরটাকে সাঁঝের আলোয় ভাল করে দেখি আমি। ভাবি হালিম চাচার বলা কথাগুলো। একটু ধানের ভুসি আর চালের কুঁড়া কিংবা মুগ, মসুর, গম, মাসকলাই, মটর, ছোলা বা খেসারির ভুসি মিশিয়ে খেতে দিতে পারলে কত না ভাল হত। একটু খড়ও নেই যে পানিতে ভিজিয়ে খেতে দেব। ভালোই হয়েছে রক্ষীরা গরু বলদ আর ষাড়গুলো নিয়ে গিয়ে। না হলে নিজেদের খাওয়ার সাথে সাথে ওদের কথাও চিন্তা করতে হত। এখন একটা মাত্র বাছুর, সকালবেলা আলের ধারে বেধে দেয়া হয়। বাঁশঝাড় থেকে বাঁশের পাতা কেটে খেতে দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশটাও কেটে রাখি আমি। হয়তো কোনও বর্গাদার কখনও চোরের মতো লুকিয়ে আসে কৃতজ্ঞতাবশত। মা তাকে বলে বাঁশটা নিয়ে হাটে বিক্রি করে দিতে, একটু চাল-ডাল-নুন-মরিচ কিনে আনতে। কিন্তু বাঁশের দামও কমে গেছে, যদিও চালের দাম বাড়ছে হু হু করে। চালের মতো বাঁশ যদি মজুত করা যেত বেশ হতো। মানুষ এখন চালই কিনতে পারে না, বাঁশ কিনবে কোথা থেকে!

ঘরের জালার ধান শেষ, ধানের বীজও শেষ। বাঁশ আর কেনে না কেউ। মা কোথা থেকে একটু যব, কাউন জোগাড় করে। যা একসময় সখ করে মাঝে মাঝে খেতাম আমরা এখন এই দুঃসময়ে তাই প্রতিবেলা খাওয়ার জন্যে মুখিয়ে থাকি। কিন্তু তাও জোটে না। বর্ষা আসে, আসে বন্যা, পিছু পিছু হাঁসের ছানার মতো চই চই করে ডেকে আনে দুর্ভিক্ষ। গ্রামের পর গ্রাম ভেসে গেছে, চোখ যতদূরই যাক না কেন জলের মধ্যেই ভাসতে থাকে। পুরো আকাশটাও যেন নেমে এসেছে বানের পানির ভেতর। বর্ষার পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে পারে আমন ধানের এই সুনাম শুনে এসেছি বাবার কাছে আরো ছোটবেলা থেকে; কিন্তু এবার সে পরাজিত হয়ে তলিয়ে যেতে থাকে বানের পানির তলে। মানুষেরা সাঁতরে সাঁতরে পুরোপুরি পাকার আগেই ধান কাটা শুরু করে। নৌকা না থাকায় সে ধান কেউ নিয়ে যায় কলার ভেলায়, কেউ আবার পাট জাগ দেয়ার মতো করে ধানের আটি পরপর সাজিয়ে লম্বা দড়ি দিয়ে বেধে সাঁতরে সাঁতরে নিয়ে যেতে থাকে স্থলের দিকে। আমাদের বাড়ির চারদিকে পানি, বাড়িটা এখন দ্বীপের মতো। সাঁতার কেটে কার কাছে যাব ভাতের খোঁজে ঠিক করতে পারি না। মা বাড়ির একপাশে অযত্নে বেড়ে ওঠা কলার বাগান থেকে কলাগাছ কেটে কলার কান্দাল রান্না করে। তেল-মরিচ-নুন ছাড়া সেই সেদ্ধ করা কলার কান্দাল একবেলা খেয়ে আমরা ভাবি, যাক এ বেলা তো কেটে গেল! বসে বসে দেখি জলে ভাসা গ্রাম-গ্রামান্তর। মণীষা আমার গা ঘেষে দাঁড়ায়, চুলে হাতচিরুনি বুলায়, কেমন প্রশান্ত চোখ মেলে ধরতে থাকে আমার চোখের অতল জুড়ে,

দেখ ভাই, এইটা দ্বীপ, রবিনসন ক্রুশোর বাড়ি। ঠিক বলি নি?

আমরা হাসতে থাকি। আমাদের চোখ পানিতে ভরে ওঠে, আমরা তবু হাসতে থাকি, বলি,

হ্যাঁ। রবিনসন ক্রুশোর বাড়ি।

আমরা দু'জন কাঁদতে কাঁদতে হাসতে থাকি।

বর্ষার পানি কমতে থাকে। বাড়ির গড়ানে উলটকমল গাছের ডালপালা কাঁদা মেখে গা ঝাড়া দিয়ে সূর্যের সঙ্গে আবারও কথা বলা শুরু করে। কাঁদামাটি মাখা ক'টা ঘাস ধীরে ধীরে মাথা তোলে মণীষার পাঁজর আর কণ্ঠার হাড় জেগে ওঠার মতো। মা তার নিজের হাড়গোড় লেপের পুরানো ঢাকনা শাড়ির মতো করে পরে ঢেকে রাখতে পারলেও মণীষার হাড়গোড় নিয়ে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমি তাই আমার হাড়গোড় উদোম করে ফেলি, আর আমার প্রায় ছেঁড়া পাতলা জামাটা চাপিয়ে দেই মণীষার গায়ের ওপর, আর বলি,

গেক, গেক না তুই?

হ্যাঁ, গেকই তো-

আমরা দু'জন হাসতে হাসতে কাঁদতে থাকি।

তারপর আমরা দু'জন বেরিয়ে পড়ি বানের পানি নেমে যাওয়া তল্লাট ঘুরে ঘুরে কচুর লতি, ভ্যান্না পাতা, মানকচু এইসব জোগাড় করে এনে মাকে অবাক করে দেব বলে। কিংবা হয়তো কোথাও বর্ষার পানি নেমে যাচ্ছে, ছেঁড়া গামছাটা ধরে দু'চারটে বেলে মাছ ধরে নিয়ে আসব। অনেকদিন পরে মুক্তির আনন্দে আমরা জোরে জোরে হেঁটে চলি, অঘোষিত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ি। কতদিন পরে আবার একসঙ্গে হাঁটছি আমরা দু'জন? মনে পড়ে না। পায়ের তালুতে কেমন ভিজে ওঠা কোমলতা ছুঁয়ে যেতে থাকে। নরম মাটি, আলও নরম, ঘাসগুলো আলুলায়িত। এরই মধ্যে আবারও জমি কর্ষণ শুর হয়ে গেছে। আখের পাতা ক্রমশঃ হলুদ হয়ে উঠছে। যাতে হেলে না পড়ে সেজন্যে কয়েকটা একসঙ্গে জড়ো করে মাঝামাঝি জায়গায় দড়ি দিয়ে বেধে দেয়া হয়েছে।

সড়কে উঠে আমরা আরও জোরে জোরে হাঁটতে থাকি। ওই তো দেখা যাচ্ছে আর একটু দূরে সড়কের ঢালুতে অজস্র কচু আর কচুর লতি। এরকম দিনে যখন কচুও দুর্লভ হয়ে উঠেছে তখন একসঙ্গে এত গাছ দেখে আমাদের ভেতরটা খুশিতে নাচতে থাকে। আমরা দৌড়ে চলি। পেরিয়ে আসি গোরস্থান, প্রাইমারি স্কুল, বটগাছ আর পাতকুয়াটাও। তারপর সড়কের গড়ান বেয়ে নামতে নামতে কচুর লতি তুলতে থাকি। তুলতে তুলতে নালার মধ্যে নেমে পড়ি। আমার লুঙ্গির কোচড় ভরে যায়, মণীষার

দু'হাত ভরে যায়, তবু আমরা কচুর লতি তুলে চলি, যেন মাছের মতোই শুটকি করে রাখা যাবে, খাওয়া যাবে দুঃসময়ে।

হঠাৎ কচুর পাতা সরিয়ে মণীষা তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে, আর্তনাদ থামে না, তীক্ষ্ণ লয়ে দীর্ঘায়িত হতে থাকে। আমি ওর চিৎকারকে অনুসরণ করে পাতার ফাঁকে তাকাই, এবং আমিও ভয়ে শিটকে উঠি, একটা শীতল পানির ধারা আমার মেরুদণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং সবগুলো লোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। আমাদের অজান্তেই আমরা দু'জন একজনের হাতের আঙুল দিয়ে আরেকজনের হাতের আঙুল পেচিয়ে ধরি। কেননা নালার মধ্যে কচুপাতার ফাঁকে পড়ে আছে একটা গলাকাটা লাশ, গায়ে কিছু নেই, লুঙ্গিটা কাছামারা। তার গায়ে এখন আর কোনও রক্তের দাগ লেগে নেই, হয়তো বাতাসে শুকিয়ে গেছে, হয়তো কোনও রাতে হালকা বৃষ্টি নেমে সবকিছু ধুয়ে নিয়ে গেছে। পুরো শরীর এখন ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে এবং একটা পচা গন্ধ, যা হয়তো আগেও ছিল কিন্তু কচুর লতি তোলার নেশায় খেয়াল করি নি, ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশে। আমার ভেতরটা থরথর করে কেঁপে ওঠে, হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ে, আমি গলাকাটা মানবদেহটার দিকে তাকিয়ে চঞ্চল দৃষ্টিতে পরখ করি খুঁজে পাওয়া যায় কি না বাবার শরীরের কোনও চেনা চিহ্ন। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারি না, মনে হয় লাশটা বলছে আমার মাথাটা এনে দাও না, আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। মনের মধ্যে একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দু'জন উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকি।

দৌড়াতে দৌড়াতে অপু-দুর্গার রেলগাড়িকেও ছাড়িয়ে আসি আমরা। আমাদের ধূসর পা আরও ধূলিময় হয়ে ওঠে, কোচড় থেকে কচুর লতি কখন যে পড়ে গেছে তা কেউই বলতে পারব না। এত কিছুর মধ্যেও আমরা একজন আরেকজনের হাত ছাড়ি নি, সন্ত্রস্ত সময় আমাদের এতই কাছাকাছি এনে দিয়েছে। আমরা যে আরও বহুদিন এইভাবে হাত ধরাধরি করে বেঁচে থাকব, অদৃশ্য নির্ভরশীলতার মাধুরিমায় ক্রমেই আরো বিবশ হব বোধকরি সেদিনই নির্ধারিত হয়ে যায়। কেননা দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে আমরা অবশেষে একটা আখের খেতের আলের ওপর বসে পড়ি, মণীষার হাড়গোড় বেরুনো পাঁজর কামারের হাপরের মতো ওঠানামা করতে থাকে, আমার পাঁজর অতটুকু না হলেও ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো নড়েই চলে। আমরা হাফাতে থাকি আর আশপাশ দেখতে থাকি। দেখতে দেখতে আমাদের দুজনের চোখ একই সঙ্গে আখের খেতের গোড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে গিয়ে স্থির হয়ে যায়। এখানেও পড়ে আছে গলাকাটা লাশ। তবে একটা নয়, তিনতিনটা। হয়তো ভেতরে গিয়ে খুঁজলে সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সবার হাতই পিছমোড়া করে বাধা। পা-ও বাধা। আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না খেতের ভেতরকার আলোআঁধারিতে। কিছুক্ষণ নির্বাক ও স্থবির হয়ে থাকি আমরা দু'জন, তারপর মণীষা আবার আর্তচিৎকার করে ওঠে। চিৎকার করতে

করতে ও দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে, হাতের আঙুলগুলো আমার কাঁধে বসে যেতে থাকে, ভয়ে ও মুখটা কেবলই বুকের মধ্যে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানে স্বস্তি খুঁজে পায় না, নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যে চোখ বোজা অবস্থায় মুখটা তুলে ধরে আকাশ পানে এবং তারপরই হড়হড় বমি করে বসে। বমির সঙ্গে বেরিয়ে আসে দুপুরের একটু আগে খাওয়া গলে যাওয়া চুলার ভেতরের পোড়ামাটি, পানিফল ও শালুক।

আমি চোখ বুজে মুখ দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে মণীষার চুলে হাত বুলাতে থাকি। মণীষা ফোঁপাতে ফোঁপাতে মিহি মসলিন-সুতোর ঢেউ তোলা কান্নার মধ্যে দিয়ে ক্লান্তিতে ধীরে ধীরে অবশ হয়ে পড়তে থাকে। আমার বুকভর্তি বমির তরলতায় ও কেবলই চুপচাপ শান্ত হয়ে যেতে থাকে। কি করব ঠিক করতে পারি না। তখনই একটু দূরে তাকিয়ে আমি পরম প্রশান্তিতে প্রায় কেঁদে ফেলি। কেননা আমি দেখি, ঘাসুড়ে হালিম নানা আলপথ দিয়ে হেঁটে আসছে দু'কাঁধে দু'টো বাইক নিয়ে। নানা কিছু বলার আগেই আমি করুণ গলায় আঙুল দিয়ে আখের খেতের ভেতরটা দেখিয়ে পরিত্রাণের আবেদন নিয়ে বলে বলে উঠি,

নানা, লাশ– গলাকাটা লাশ।

নানা কিছু বলে না। নির্বিকার ভঙ্গিতে তাকিয়ে দেখে। তারপর বলে ওঠে আপন মনে,

শালারা দুনিয়ায় আর খেত পায় নি। আমার খেতে মা'রে রাখে গেছে!

তার কথা শুনে মনে হয়, লাশ সবসময়ে গলাকাটাই হয়। সেটা কোনও ব্যাপারই নয়, বড় ব্যাপার হল লাশগুলো তার খেতের মধ্যে থাকবে কেন! আমার কোলের মধ্যে চোখ বুজে পড়ে থাকা মণীষার দিকে তাকিয়ে নানা আবারও বলে,

তোমার বুইন না?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। নানা মণীষাকে আড়াল করে ঘুরে বসতে বলে আমাকে। ঘুরে বসে পেছন ফিরে দেখি, হালিম নানা লাশগুলোর পা ধরে টেনে টেনে সামনের আরেকটা খেতে রেখে আসছে। কিছুক্ষণ পর নানার হাত ঝাড়ার শব্দ শোনা যায়।

ন্যাও, কাজ ফিনিশ। ইবার চল তোমাগের আগিয়ে দিয়ে আসি।

আমি মণীষাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে হাঁটতে থাকি। সারা রাস্তা মণীষা যেন ঘুমিয়েই থাকে। আর আমি জেগে থেকেও অনুভব করি চারপাশে গলাকাটা লাশ পড়ে আছে, ক্রমশই সংখ্যা বাড়ছে তাদের। কখনও কখনও কোনও কোনও গলাকাটা লাশ আবার উঠে আসছে, হাঁটছে আমাদের পাশাপাশি; ফসলের সমারোহে দুলতে থাকা

খেতখামারে যেমন শুধুই একটা লাঠি পুঁতে গায়ে জামা পড়িয়ে মাথায় ভাঙা পাতিল বসিয়ে তৈরি করা হয় কাকতাড়ুয়া ঠিক তেমনি করে গলাকাটা লাশগুলোকে হাটেমাঠেঘাটেবাটে ফেলে রেখে, মিছিলের সামনে খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে বানানো হচ্ছে এক-একটা মানুষ-তাড়ুয়া। মানুষ-তাড়ুয়ারা বিভৎস ভেংচি কাটছে আমাদের দিকে তাকিয়ে। তাদের ভয়ে আমরা আর হাটে মাঠে ঘাটে বাটে যেতে পারছি না। পারছি না একটুকরো রুটির জন্যে, একমুঠো ভাতের জন্যে বের হতে রাস্তায়। খুব কষ্ট করে কোনওকিছু জোগাড় করে খেলেও আবার বমি করে ফেলছি তাদের সেই বিভৎস ভেংচি দেখে।

এমনকি মানুষ-তাড়ুয়া বানানো মানুষগুলোকেও দারুণ ভয় আমাদের। যেকোনও মুহূর্তে তারা তো আমাদেরও বানিয়ে ফেলতে পারে মানুষ-তাড়ুয়া। আমরা তাই সযত্নে সভয়ে তাদেরও এড়িয়ে চলি।

চলতে চলতে সড়কের দিকে তাকিয়ে দেখি মানুষ-তাড়ুয়াদের ভয়ে, মানুষ-তাড়ুয়া বানানো মানুষগুলোর ভয়ে দলে দলে মানুষ যাত্রা করেছে নিরুদ্দেশের দিকে। তারা কেউ ভালো করে হাঁটতে পারছে না, খোঁড়াচ্ছে কেউ, লাঠিতে ভর দিয়েও কেউবা হোঁচট খাচ্ছে বারে বারে। বন্যা এসে তাদের নিঃসহায় করে রেখে গেছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে দূরের শহর। সেই শহরের টানে তারা হাঁটতে না পারলেও হেঁটে চলেছে। অথবা এ যেনবা বাবার বলা সেই পুরানো ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি,– ব্যাবিলন থেকে মানুষের দল ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে, সারা পৃথিবীতে।

এইসব ধকল পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠার আগেই মায়ের কথায় স্কুলে যাওয়া শুরু করি আমরা। স্কুল ঠিকমতো হয় না, মাস্টাররা কেউ খেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কেউ এসে ক্লাসের ঘন্টা শেষ হওয়ার আগেই চলে যায় বড় হাটে যাওয়ার অজুহাতে। কোনওদিন আবার শ্রাবণ মাসের ছিচকাঁদুনে বৃষ্টি নামে। ছাত্র কম থাকার অজুহাতে তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি দিয়ে দেয় মাস্টারেরা। সেদিনও থমথমে আকাশ। সোলায়মানের

দোকানে গিয়ে সাতসকালে হাজির হয়েছি আমি সাতসকালে। সোলায়মান ফুল ভল্যুমে রেডিও বাজাচ্ছে। কিন্তু কোনও গান বাজছে না আজ। মেজর ডালিম নামে কে একজন বার বার বলছে শেখ মুজিবকে না কি সপরিবারে খুন করা হয়েছে। শুনে বিশ্বাস হয় না। শেখ মুজিব কি আর আমাদের গ্রামের সোবহান খানের মতো মানুষ না কি যে চাইলেই খুন করা যাবে, তাও পরিবারশুদ্ধ! আমরা বাঁশের মাচালের ওপর বসে নানা জল্পনাকল্পনা শুরু করি। ক্রমশঃ লোকের ভিড় বাড়তে থাকে। কিন্তু কেউ কোনও মন্তব্য করে না। সোলায়মান বিজ্ঞের মতো আমাকে বলে সামনে বহু দিন না কি আর স্কুল কলেজ কিছুই হবে না। আমি তবু একদিন স্কুলে যাই মণীষাকে নিয়ে। স্কুল শুরু হওয়ার আগে এ্যাসেম্বলি হয় আমাদের। তার আগেই ছাত্রদের দেখি কানাঘুষা করছে। সবার আলোচনাই ঢাকার ঘটনা নিয়ে। ছাত্রীদের কমনরুম স্কুলের অফিসঘরের পাশে, আর অফিসঘরের সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে স্টেজের মতো। এ্যাসেম্বলি শুরু হওয়ার সময় সেখানে স্যাররা এসে দাঁড়ান। স্টেজের সামনে মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাঁশের স্ট্যান্ড। সেটাতেই জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয় এ্যাসেম্বলির একেবারে শুরুতে। ছাত্রদের সবাইকে কোনও কথা বলার থাকলে তাও বলেন তাঁরা ওই সময়ে। আমরা সবাই ক্লাস আর উচ্চতা অনুযায়ী পাঁচটা ভাগে ভাগ হয়ে পতাকার সামনে দাঁড়াই। শপথ নেই একসঙ্গে দেশরক্ষার, দেশজাতি ও সমাজ সেবার, পিতামাতা গুরুজন সবাইকে মান্য করার। যাদের গলা ভাল তাদের ডাকা হয় পতাকার কাছে, জাতীয় সঙ্গীত শুরু করে তারা, আমরা গলা মেলাই। আমাদের গেম স্যার হালকা পিটি প্যারেড করান। এইসব শেষ হলে ক্লাস শুরু হয়।

মৌলভী স্যার খুব একটা আসেন না এ্যাসেম্বলিতে। আজ দেখি তিনিই সবার আগে হাজির। চোখমুখ দিয়ে বেশ জেল্লা বেরুচ্ছে। তুলনায় গেম স্যার, আরো দু'চারজন স্যার একেবারেই ম্রিয়মান। আমাদের ক্যাপ্টেন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ঘোষণা দিতেই মৌলভি স্যার নড়েচড়ে ওঠেন,

দাঁড়াও। এই জাতীয় পতাকা তো এখন পাল্টে যাবে। এটা তুলে আর কি করবে?

গেম স্যার মিনমিন করে বলার চেষ্টা করেন,

তুলুক না। এখনও তো ঘোষণা দেয় নাই। আগে সরকার পাল্টানোর কথা বলুক, তারপরে–

গেম স্যারের কথা শেষ হয় না। মৌলভি স্যার কথা কেড়ে নেয়,

সব কথা সরকারকেই বলতে হবে না কি? আমরা বুঝি না? সরকার তো আমাদেরই। আমরা কি একেবারেই না-বুঝ?

গেম স্যার চুপ মেরে যায়। মৌলভী স্যার তার বয়ান শুরু করেন। এখন থেকে এ্যাসেম্বলি শুরু হবে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে। শপথ নেয়ার আগে সবাইকে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে। যার যেরকম ইচ্ছা সেরকম পোশাক পরে আসা চলবে না। কেননা সরকার জাতীয় পোশাক ঠিক করেছে। ছাত্রদের সবাইকে পায়জামা পাঞ্জাবি আর টুপি পরে আসতে হবে। ছাত্রীদের পড়তে হবে সালোয়ার কামিজের সঙ্গে বিছানার চাদরের মতো বড় ওড়না, যাতে মাথার ওপরে গিয়ে চুল ঢেকে কোমর অব্দি জড়িয়ে রাখা যায়। শুনতে শুনতে আমার মনে হয় আবারও কিছু দিন স্কুলে আসাটা বন্ধ হয়ে গেল আমাদের। মণীষার ওড়নাটা না হয় মা'র শাড়ি ছিঁড়ে বানানো যাবে, বাবার পাজামা পাঞ্জাবি কি আর লাগবে আমার! এই দুর্দিনে মা'র কি আর সম্ভব হবে আমাকে পাজামা পাঞ্জাবি কিনে দেয়া! তারচেয়ে এখন বর্গাদারদের খেত চষার জন্যে, হালআবাদ আর সার বীজ কেনার জন্যে টাকা দেয়া অনেক বেশি জরুরি। তবু আমি মনোযোগ দিয়ে মৌলভী স্যারের কথা শুনতে থাকি। মৌলভী স্যার মনে হয় হেড স্যার আর গেম স্যারদের জব্দ করার বেশ ভাল মওকা পেয়েছেন আজ। জোরে জোরে মুখ বাকিয়ে তিনি কথা ছুড়ে চলেছেন,

আগে যা হয়েছে, হয়ে গেছে, এখন আর বেশরিয়তী কাজকাম চলবে না। আল্লাহ কখনও সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। কত বড় বড় শ্লোগান শুনলাম, সব শ্লোগান বরবাদ হয়ে গেল। খোদার গজব এইভাবেই নামে। এক নেতা এক দেশ এক রাতেই সব শেষ। খালি তাই না। গুষ্টিশুদ্ধ সব শেষ। মাদ্রাসা তুলে দিতে চেয়েছিল, এখন নিজেই উঠে গেছে। লাল ঘোড়া দাবড়াতে চেয়েছিল, এখন আর উঠে বসারও ক্ষমতা নাই। কাফেরের দেশ ভারত,– তার সাথে দোস্তি করতে গেছিল, আল্লাহ খালি আড়াল থেকে মুচকি হেসেছিল। বান্দার কি ক্ষমতা আছে তার সঙ্গে পাল্লা দেয়ার? নাই একদম নাই। পাল্লা দিতে গেছিল। তার ফল হাতে নাতে পেয়েছে। শিক্ষা নাও, এইসব থেকে শিক্ষা নাও। মুসলমানরা হলো ভাই ভাই। দেশ আলাদা হতে পারে, রাষ্ট্রপ্রধান আলাদা হতে পারে, শরীরে তো একই রক্ত। যেখানেই থাক না কেন, মুসলমানের প্রতিটা কণাই আল্লার নাম জিগির করে। ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল হতে পারে। তারপরেও ভাই সবসময়েই ভাই। মুসলমানরাও তাই। পাকিস্তানের মুসলমানরাও ভাই আমাদের। খোদা এক, নবী এক, ধর্ম এক, কলেমা এক। মারামারি হয়েছিল, তাই বলে কাফের হিন্দুদের সাথে হাত মেলাতে হবে? কখনই না। আল্লাহ এইসব পছন্দ করে না, নিজেদের চোখেই তো দেখলে কি অবস্থা হলো কাফেরদের সাথে হাত মিলিয়ে!

আমরা নীরবে মৌলভী স্যারের কথা শুনতে থাকি। আকাশে মেঘ ঘনিয়ে উঠতে থাকে। অথচ বাতাস স্থবির হয়ে পড়ে। মৌলভী স্যার ছাড়া আর সবাই মনে হয়

তাদের কণ্ঠকে বাজারের নির্মাণাধীন মসজিদটার দানবাক্সে জমা দিয়েছে। আর মৌলভী স্যার পেয়েছেন কোনও কিছু বয়ান করার অপরিসীম ক্ষমতা। তিনি তাই বলেই চলেন,

ওই জয় বাংলা কাদের শ্লোগান? কাফেরদের, বুঝতে পেরেছ? জয় হিন্দ-এর সাথে মিলিয়ে শ্লোগান বানিয়েছে জয় বাংলা। কেন বানিয়েছে? থাকতে দেবে না, মুসলমানদের একসঙ্গে থাকতে দেবে না। ভায়ে ভায়ে বিবাদ বাধিয়ে দিয়ে আলাদা করে ফেলবে, হিন্দুদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। সেইজন্যেই এত কেরামতি, কোনও সময়েই তো বলে না জয় বাংলাদেশ! কেন বলে না? দুই বাংলা এক করে তাদের প্রদেশ বানাবে বলে। আলাদা দেশ বানাবার ইচ্ছাই যদি থাকত কেন বলতে পারত না পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ? তা বলে নাই। বলতে অসুবিধা কি? উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানী নামে আলাদা আলাদা দেশ নাই না কি? কিন্তু তা বলেন নাই ওনারা। কেননা ওনাদের ইচ্ছাই ছিল যে ভাষা এক সংস্কৃতি এক জীবনযাত্রা এক এইসব গুলগপ্পো মেরে অবশেষে একদিন বলে বসবে যে, চল আমাদের মধ্যে এত মিল! আমরা তার চেয়ে এক হয়ে যাই।

মৌলভী স্যার একটু থামেন। অনেকদিন পরে একসঙ্গে এত কথা বলে একটু হয়রান হয়ে পড়েন, গলাটাও বোধহয় শুকিয়ে আসে। তাছাড়া এটা তো আর শীত মৌসুম নয় যে দৈনিক মিলাদ মাহফিলে কিংবা ধর্মসভায় গলাবাজি করার কারণে কণ্ঠ সবসময়েই চাঙ্গা থাকবে। তিনি তাই গলাকে বিশ্রাম দেন একটু সময় আমাদের প্রশ্নহীন নিরবতার মধ্যে দাঁড় করিয়ে। তাতে বোধহয় তিনি একটু নিশ্চিতও হন যে পরিস্থিতি মোটামুটিভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তারপর আবারও বলেন,

এইসব কথা তোমাদের জানতে হবে, ধর্মজ্ঞানে মানতে হবে। এতদিন এগুলো বলার মতো পরিস্থিতি ছিল না। এখন সবকিছু তাড়াতাড়ি জেনে নিতে হবে। সবসময় তো পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে না। আমাদের দ্বীনের নবী হযরত মোহাম্মদ আলাইহিস সাল্লাম-এর কথাই ধর না। তাঁকে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছিল। কিসের জন্যে? না, মক্কায় তাঁদের আর কথা বলার মতো পরিস্থিতি ছিল না, তাঁদের জীবনের হুমকি ছিল। একাত্তর সালের পরে আমাদের অনেক সা চ্চা মুসলমানকেও তেমনি বাংলাদেশ ছেড়ে হিজরতে যেতে হয়েছে। অনেকে আবার পরে জানের মায়া ত্যাগ করে আমাদের কাণ্ডারির হুকুমে ফিরে এসেছেন। খুলনার আনসার আলী সাহেবের কথাই ধর না। তার নাগরিকত্ব তো ওই ভাঙ্গাবন্ধু না ব্যাঙ্গাবন্ধু কি নাম যেন, গেম মাস্টার সাব ভাল বলতে পারবেন,- ওই মুজিব সাব আর কি, তিনি তো কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে? তাঁর আত্মীয়স্বজনই তদবির করে সেটা আবার খারিজ করার ব্যবস্থা করেছেন। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। রাবণের বংশেও বিভীষণ থাকে। তারাই দ্বীন-ই-দ্বীনিয়াত প্রতিষ্ঠার পথ খোলাসা করে। এখন সময় হয়েছে, হিজরত শেষে আবার

আমাদের প্রবাসী মুজাহিদ ভাইয়েরা ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে দেশে ফিরে আসবে ইনশাল্লাহ্।

তারপর মৌলভী স্যার যখন আবার কথা বলা শুরু করেন, বলেন, ওই জয় বাংলার বড়ি জনগণ আর কোনওদিন গিলবে না তখনই কড়াৎ করে বাজ পড়ে স্কুল ঘরের ওপর। আমরা হুড়মুড় করে দৌড় দিয়ে ক্লাসঘরে গিয়ে ঢুকি। আমার হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে প্রকৃতির আপন ভাষার কথা, নিজস্ব আচরণের কথা। মনে হয় শ্রাবণের যে মেঘলা আকাশ ফুঁড়ে এখন বজ্র পড়ার কোনও কথা নয় সেই আকাশ নিজেই পথ হেঁটে বজ্রের ঘরে গিয়ে তাকে ডেকে এনেছে। বজ্র এখন শুধু আকাশকেই বিদীর্ণ করছে না, আকাশকে বিদীর্ণ করার অছিলায় সে আসলে বিদীর্ণ করছে সেই আকাশের ছায়ার নিচে দাঁড়ানো সমূহ অবয়বকে। আমাদের স্কুলঘরের টিনের চালা বার বার কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে, বাতাস তাকে টেনে তুলে হয়তোবা অসাবধানতাবশত আবারও ছেড়ে দেয় ঘরের কাঠের বাটামের ওপর। প্রতিটা কম্পনের তীব্র আঘাত আমাদেরকেও আতংকিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, যেন মৌলভী স্যারের কথা শোনার অপরাধে আমাদের বিরুদ্ধে এর মধ্যেই দণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা আমাদের কিশোরসুলভ চপলতায় প্রথম প্রথম ঝড় দেখার বাহাদুরি দেখাতে একটুআধটু আগ্রহী হলেও অচিরেই সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি, আমাদের কেউ বলে দেয় না, কিন্তু মানসিকভাবে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে আজকের ঝড় একেবারেই আলাদা, আজকে ক্লাসঘরের বারান্দায় গিয়ে ঝড় দেখার কিংবা মাঠে গিয়ে বাতাবি লেবু দিয়ে ফুটবল বানিয়ে তার পেছনে ছুটোছুটি করাটা হবে ঘোরতর বোকামি।

ঝড় থামতেই আমাদের স্কুল ছুটি দিয়ে দেন স্যারেরা। স্কুল থেকে দলে দলে বেরিয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়ি যার যার বাড়ির দিকে। ফিরতে ফিরতে আমার আবারও স্কুলের নতুন পোশাক বানানোর চিন্তা ফিরে আসে। আমি মণীষার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি বাড়ি ফিরে কেমন করে নতুন এই এলানের কথা বলা হবে। এখন এই বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়া আর স্কুল থেকে বাড়িতে ফেরা,– আমার আর মণীষার পাশাপাশি হাঁটা এইটুকুই। আমাদের এই সামান্য পথ চলাতেই তবু বাবা বার বার ফিরে আসে, পথ হাঁটে, কথা বলে। আমরা কোনও কথা বলি না, যেন বাবার কথায় ছেদ পড়বে, স্তব্ধতার মধ্যে আমরা বাবার সেই কথা বলা শুনতে থাকি। এ-ও ভাবি, ক'দিনই বা আর! তারপরে মণীষাকে আসতে হবে একা একা, কেননা আমি চলে যাব নিশ্চয়ই কলেজের পথে,– হোক তা জেলা শহরের অথবা নেহাতই কাছের থানা শহরের।

ঝড় শেষ হয়, বৃষ্টি তবু কিছুতেই থামে না। বাড়ি পৌঁছানোর আগেই ভিজে একসা হই আমরা। উঠোন পেরিয়ে ঘরের বারান্দায় উঠতে উঠতে দেখি বাবা ফিরে এসেছে। তার শরীর রোগা হয়ে গেছে, চোখের কোণে চালসে পড়েছে, দু'হাতের কনুই কী

অসম্ভব কালোই না হয়ে উঠেছে। শুধু একটা অভ্যাস এখনও রয়ে গেছে। চশমা চোখে না দিলেও শেখ মুজিবের মতো হাতে চশমা ধরার বিশেষ ভঙ্গিটা। আমি সেই ভঙ্গির মধ্যে মৌলভী স্যারের বলা কথাগুলোর ত্রিকালমূর্তি খুঁজি। কিন্তু তা খুঁজে পাওয়ার কিংবা না থাকবার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার আগেই মণীষার আনন্দ-সম্ভাষণ আর চিৎকার ও উল্লাস সে মূর্তির অস্তিত্ব কিংবা কল্পিত-অস্তিত্ব ভেঙেচুরে খানখান করে ফেলে। এই যে শ্রাবণ দিন, এ দিন এখন নির্ভাবনার, সম্ভাবনার। এখন কোনও অভাব নেই এদেশ জুড়ে, যদি ইচ্ছা করে বাঘের দুধও খেতে পারব আমরা অনায়াসে। মণীষা বাবার বুকে মাথা রেখে কাঁদে না কি হাসে বোঝা যায় না। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাই দেখে চলি। অনুভব করি নিজের বুকের মধ্যেও শ্রাবণের ঝরঝর বাদলধ্বনি।

আরও একটু পরে বাবা বলে,

আমি বরং হাট থেকে একটু ঘুরে আসি। কি খেতে চাও আজ তোমরা সবাই?

আমরা কোনও কিছু বলতে পারি না। এই কয়েক মাসের মধ্যে আমরা সবকিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সব খাদ্যই আমাদের কাছে পরম খাদ্য হয়ে গেছে। কিন্তু বাবা তা বুঝতে চায় না। বার বার আমাদের মুখের দিকে তাকাতে থাকে। মণীষাও ক্রমাগত আমাদের মুখ দেখতে থাকে। তারপর অনেক হিসাব কষে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে,

গরম ভাত আর মাসকলাইয়ের ডাল খাব বাবা।

আর মা যেন এতদিন ধরে বুকে পাষাণ বেধে ছিল, পেটে পাথর বেধে ছিল শুধুমাত্র এরকম একটি দিন আসবে বলে, এরকম একটি দিনে এমনি করে একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে মণীষা এতদিনের কষ্ট আর অপমান জানিয়ে দেবে বলে; আজ সেই ইচ্ছাপূরণ শেষে মা তাই হঠাৎ গমকে গমকে কাঁদতে থাকে। কাঁদে আর অনবরত চোখের জল মুছে চলে এমন বিশিষ্টতায় যে মনে হয় আঙুল বাঁকিয়ে কাচের ওপর থেকে জল মুছছে, মুছে যাওয়ার পরেও খানিকটা থেকে যাচ্ছে তার আপন স্বভাবগুণে।

বাবার বাজার করে ফিরতে সন্ধ্যা হলো। আমিও সঙ্গে ছিলাম। দেখলাম যারা এতদিন আমাকে এড়িয়ে চলেছে তারাই এগিয়ে এসে হেসে হেসে কথা বলল বাবার সঙ্গে। আমার মাথায় হাত রেখেও হাসল মাঝে মাঝে। বাজার করতে করতে তাই বাবার অনেক সময় লেগে গেল। আমরা বাপবেটা মিলেও টেনে আনতে পারব না এত বাজার! চাল কেনা হলো পোলাও আর শাদা ভাতের। ডাল কেনা হলো মুসুরির, মণীষার প্রিয় মাসকলাইয়ের আর খিচুড়ি রাধবার জন্যে মুগের। তেল কেনা হলো সরিষার, সয়াবিনের, নারিকেলের, কেরোসিনের। যেন অনেকদিন পরে এক উৎসব

করতে চলেছি আমরা। এসব যে নিত্যদিনই প্রয়োজনীয় তা ভুলে গিয়েছিলাম কি অনায়াসে। বাবা এসে আবারও মনে করিয়ে দিল।

অনেকদিন পরে আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যাবাতি জ্বলল। মণীষা আবারও হ্যারিকেন পরিষ্কার করতে বসল পুরানো কাপড় জোগাড় করে। তখনই আবিষ্কার করা গেল যে চিমনি নেই কোনও হ্যারিকেনের। কখন কবে যে রাত বাহিনী কিংবা রক্ষী বাহিনীর কোপানলে পড়ে হারিকেনের চিমনি ভেঙে গেছে তা আর খেয়াল করি নি আমরা কেউই। আবারও আমি ছুটলাম সোলায়মানের দোকানে চিমনি কিনে আনতে।

দূর থেকেই খেয়াল করলাম দোকানের সামনে বাঁশের মাচালের জটলা আজ আগেকার চেয়ে অনেক বেশি। তাদের জমজমাট আড্ডা আমার বাবাকে ঘিরেই। এতদিন পরে ফিরে এল! অনেকেই তো চলে গেছে, কেউই তো ফিরে আসে নি! আমাদের গ্রামে গণ বাহিনীতে গিয়ে জীবিত ফিরে আসার ঘটনা এই প্রথম। আমি সেই জীবিত মানুষটির একমাত্র উত্তরাধিকার। আড্ডার মানুষদের কেউ সসম্ভ্রমে কেউ রুদ্ধশ্বাস কিছু ঘটার অপেক্ষাতে আমার দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল। আমি যখন সোলায়মানকে বললাম চিমনি কিনব তখন সে-ও এমনভাবে তাকাল যে মনে হলো চিমনি নামে তো কোনও পণ্য আসলে পাওয়া যায় না। তারপর এত দ্রুত চিমনি তাক থেকে নামাতে গেল যে একটা ভেঙেই গেল। অন্যদিকে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের চাপে একটা দিয়াশলাইয়ের খোল ভেতরের দিকে বসে গেল। চাচামতন এক লোক অনেক সাহস গছিয়ে আমি চলে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে প্রশ্ন করল,

গ্যাদা, তোমার বাবা নাকি ফিরি আসছে?

হ্যাঁ, ফিরে এসেছে- আমি গর্বিত ভঙ্গিতে বলি। আমার কন্ঠস্বরের সঙ্গে মিশে যায় টেলিমেকাসের গুপ্ত ঔদ্ধত্য। বাতাসকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি আবারও ভেজাতে থাকে। বাতাস এসে লুকাতে চেষ্টা করে আমার ত্বকের ভেতর। বৃষ্টি তাকে পিছু পিছু তাড়া করে এসে আমাকেও ভিজিয়ে রেখে চলে যায় একই সঙ্গে। ভেজা ভেজা ত্বককে শরীরের ভেতর থেকে কাঁপুনি উঠে এসে ওম দিতে চেষ্টা করে। মুরগির মাংস আর আলুর ঝোল থেকে কেমন আকাবাকা হয়ে ধোঁয়ার তরঙ্গ উঠছে দেখে আমার কাঁপুনি থেমে যায় একেবারেই। আলুর টুকরোগুলো কেমন বড় বড়! আর ঝোলও কেমন গাঢ়! আমার লোভ এবং ভয় দুটোই পেয়ে বসে। মনে হয় গলায় আলুর টুকরো আটকে যাবে, মাংসের কাটা ফুটবে, সুরুয়া শ্বাসনালীর ভেতর ঢুকে যাওয়াতে আমি আর শ্বাস নিতে পারব না। কিন্তু অন্তহীন লোভ আমাকে ঘিরে ধরে। আমি নিজেকে রোধ করতে পারি না। গোগ্রাসে গিলতে থাকি গরম ভাত আর মাংস। ভেতরে ভেতরে আমি যে এসবের জন্যে এত ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম সেটা টের পাওয়ার পরেও নিজেকে সামাল দিতে পারি

না। মা আমাদের বাতাস করে চলে। বাবা আমাদের পিঠে হাত বুলোয়। আমরা এইসব স্নেহ উপলব্ধির বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি গরম ভাতকে সামনে রেখে।

কিন্তু আজ শ্রাবণগহন রাত। ক্লাস নাইনে পড়ি, তবুও নিশ্চয়ই বাবা আমাদের কোনও নতুন গল্প শোনাবেন এই আশায় আমি বসে থাকি। হঠাৎ চেয়ে দেখি বাবা ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বই রাখার আলমারিটার ভাঙা কাচের গ্লানি ঢেকে দিয়েছে শেখ মুজিবের ছবি। পুরু লেন্সের কাচ ভেদ করে তার চোখ দুটো যেন আমাকে বলছে, তোর বাবা ওরকম চশমা ধরার ভঙ্গিতে হাত মুঠো করে আছে কেন? তখন কোথাও লোবাণের গন্ধও ভাসতে থাকে, ভাসতে ভাসতে আমার ভেতরে এসে ঢোকে। হাট থেকে বাবা আগরবাতিও কিনেছিল, মনে পড়ে। মা নতুন কেনা সুই সুতোয় ছেঁড়া বালিশের কভার সেলাই করে চলে, মণীষাকে দায়িত্ব দেয় বাসনপত্র গুছিয়ে রাখার।

বাবা ঘরে আসে না। আমাদের নতুন কোনও গল্প শোনার জন্যে উন্মনা রেখে সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টেনে চলে। টিপটিপ বিষ্টির মধ্যে সিগারেটের আলো জ্বলে ঝোড়ো সমুদ্রের বাতিঘরের ঝাড়লণ্ঠন হয়ে। টানতে টানতে বাবা আপন মনে গানও গাইতে থাকে। গান নয়, তার কণ্ঠ থেকে আমি নিঃস্বতা ঝরে পড়তে দেখি :

কূজনহীন কাননখানি দুয়ার দেয়া সকল ঘরে

একেলা কোন পথিক তুমি পথিকহীন পথের পরে

হে একা সখা হে প্রিয়তম

রয়েছে খোলা এঘর মম

সমুখ দিয়ে স্বপনসম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে

আজি শ্রাবণঘন গহন মেঘে .....

নিঃস্বতা ঝরাতে ঝরাতে গহন মেঘের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাবা ঘরের মধ্যে ফিরে আসে। আকাশে মেঘ ডাকে, বাবাও ডাকে আমাদের। সে ডাকের তলদেশে বিক্ষোভ করে আকাশ-মেঘের অতন্দ্রতা, যে তাকে বুঝতে পারে শুধু তার জন্যেই অকাতরে বিলিয়ে দেয়া আকুলতা,

এস, এই মানুষটার জন্যে আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে সময় কাটাই।

বাবা গিয়ে শেখ মুজিবের ছবির সামনে দাঁড়ায়। মা'র ভ্রুটাকে সামান্য সময়ের জন্যে কুঁচকে উঠতে দেখি আমি। কিন্তু মুখে কিছুই বলে না মা। হাতের কাজ থামিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। আমাদের সবার দিকে ইতিউতি করে তাকিয়ে গতিক বিশেষ সুবিধার নয় বুঝতে পেরে মণীষাও বলে না কিছুই। প্রার্থিত নিরবতার মধ্যে দিয়ে কিছুটা সময় পার করি আমরা। তারপর বাবা তার খাটের কার্নিশে হেলান দিয়ে

আবারও সিগারেট ধরালে মণীষার মুখে দুষ্টুমির হাসি ফিরে আসে। ফিরে আসে বাবার কণ্ঠে আসন্ন গল্প শোনার অধিরতা।

বাবা আমার দিকে তাকায়,

তোমার কি শরণার্থী শিবিরের কথা মনে আছে তথাগত?

আমি শরণার্থী শিবিরের কথা মনে করার চেষ্টা করি। অজস্র লোকের ভিড়, চেনা মুখও অচেনা লাগে। কারা যেন কাঁদছে জোরে জোরে। বোধহয় এক বুড়ি বদনা খুঁজে না দেয়াতে ব্যাটার বউ আর নাতিনাতনিদের নিঃস্বার্থভাবে গাল দিয়ে চলেছে, ফাঁকে ফাঁকে ছেলের উদ্দেশ্যেও অবরুদ্ধ ক্ষোভ ঝাড়ছে ছেলেটা এসবের কোনও খোঁজই রাখে না বলে। পেছনে কোথাও একজন মা তার ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে আদুরে গলায়, 'আয়রে পাখি লেজ ঝোলা..'। কোনও কিছু ভাল করে মনে পড়ে না। মাঝে মাঝে মনে পড়ে পতাকা উড়ছে তড়তড়িয়ে, রঙ সবুজ, মধ্যে লাল গোল বৃত্ত, তার ভেতরে হলুদ রঙের মানচিত্র। হলুদ যেন কিসের প্রতীক? আমি স্মৃতিঘর হাতড়ে বেড়াই, উত্তর খুঁজে পাই না। বাবা অবশ্য আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষাও করে না। আপন মনেই বলে চলে,

তোমাকে আর তোমার মাকে শরণার্থী শিবিরে রেখে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম দেরাদুনে, কেননা শরণার্থী শিবিরে নাম লেখানোর জন্যে ওরা আর যুদ্ধে যেতে দিচ্ছিল না।

মণীষা বাবার কথাকে মাটিতে পড়তে দেয় না, ফস করে বলে বসে,

তথাগতর মা দেখতে কেমন ছিল?

বাবা যেন বাস্তব জগতে ফিরে আসে। তার মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে, একবার মা আরেকবার মণীষার দিকে তাকিয়ে বাবা বলে,

দুষ্টুমি হচ্ছে?

মণীষা ঠোঁটে হাত চেপে কুটকুট করে হাসতে থাকে,

না- না বাবা, সত্যি বলছি, বল না তুমি।

কিন্তু বলে না বাবা। ঘরের চালের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিক সময়, তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিরে যায় শরণার্থী শিবিরে,

গায়ের ঘাম ঝরিয়ে, জীবনের মায়া তুচ্ছ করে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিল ওইসব শিবিরে, শরণার্থী হয়ে। ছিল আমাদের চেয়েও বড় বড় নেতা, সেই সুবাদে শরণার্থীদের চেয়েও বেশি সুযোগ সুবিধা পেয়েছে তারা। সুখে নির্বিবাদে তারা সময় কাটিয়েছে আর ভারতীয় দাদাদের সঙ্গে চা খেতে খেতে

যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে গল্প করেছে, নিজেদের মধ্যে আলাপ করার সময় যুদ্ধের নিকুচি করেছে, তাড়াতাড়ি কিভাবে যুদ্ধ শেষ করা যায় তাই নিয়ে পরামর্শ করেছে আর বলে বেড়িয়েছে, যুদ্ধ বেশিদিন করলেই সব বাঙালি নকশাল হয়ে যাবে। ফিরে এসে এরা সবাই বড় বড় মুক্তিযোদ্ধা সেজেছে। এরা কেউ কিছু হারায় নি, কিন্তু আমি শরণার্থী শিবির থেকে তথাগতর মাকে ফিরিয়ে আনতে পারি নি।

বাবা একটু থামে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আবারো বলে,

এরা কেউই যুদ্ধ চায় নি। এমনকি মুজিব ভাইও চেয়েছেন কি না সন্দেহ আছে আমার। কিন্তু একথা তো ঠিক তিনি চান বা চান আমরা তাঁর নামেই যুদ্ধ করেছি। ভেবেছি দেশ স্বাধীন হলে মুজিব ভাই ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে, যারা যুদ্ধ না করে যুদ্ধের নামে বাগাড়ম্বর করেছে তারা কোনঠাসা হয়ে পড়বে। মুজিব ভায়ের নাম যে কোটি কোটি অস্ত্রের চেয়েও আমাদের কাছে বেশি শক্তিশালী ছিল তা তোমরা এখনকার ছেলেমেয়েরা কেউই বুঝতে পারবে না। দেখ আকাশসমান জনপ্রিয়তাও কেমন করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে! একটা মানুষও তাঁর শোকে কাঁদে না! আমার দম আটকে আসে ভাবতে গেলেই।

আমরা সবাই মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকি।

ভেবেছিলাম বাবাকে বলব একটা সাইকেল কিনে দিতে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। হেমন্তের এক বিকেলে জলপাই বাহিনীর লোকেরা এসে ধরে নিয়ে গেল বাবাকে। মা তখন চুলার পারে। বাবা বসেছিল কাঠাল গাছের নিচে একটা চেয়ার পেতে। আর মণীষা সেই চেয়ারটার পেছনে দাঁড়িয়ে বাবার গলা জড়িয়ে গল্প করছিল। বাবা বলছিল আর ক'দিন বাদেই আমাদের হেমন্তের চাঁদ দেখাবে। ধান কাটা হয়ে গেলে হেমন্তের চাঁদ না কি রাতের বেলা প্রতিদিন অনেক রাতে খেতের শিয়রে এসে মৃত্তিকাকে সান্ত্বনা দেয়। মাঠের মুথা ধানের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইঁদুরেরা তখন সেই মাঠে বেড়াতে আসে। চাঁদকে বলে, ও চাঁদ মামা, তুমি যেন আমাদের ঘোরা শেষ হওয়ার আগে কিছুতেই ডুবে যেও না। তাহলে প্যাঁচা এসে নির্ঘাত আমাদের গিলে খাবে।

হঠাৎ একসাথে অনেকগুলো বুটের আওয়াজে আমরা ফিরে তাকালাম। দেখলাম সড়ক থেকে আলপথে নেমে এসেছে একদল আর্মি। ওরা যে বাবাকেই ধরে নিয়ে যাবে তা আমরা একটুও টের পাই নি। যদিও ওদের বুটের আওয়াজের সঙ্গে রক্ষীদের বুটের আওয়াজের কোনও তফাৎ নেই; তারপরও যে কেন ওরকম মনে হয় নি তার কোনও ব্যাখ্যা আজও খুঁজে পাই নি আমি।

জলপাই বাহিনীর একজন খুব চটপটে কণ্ঠে বাবার নাম জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হওয়ার পরে বলেছিল,

আমরা আপনার বাড়িটা একটু চেক করব।

বাবা নিস্পৃহভাবে বলেছিল, করুন।

জলপাই বাহিনীর লোকেরা খেত নিড়ানি দেয়ার নিপুণতায় সারা বাড়িঘর তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি করেছিল। তবে রাত বাহিনী কিংবা রক্ষী বাহিনীর মতো কোনও অসৌজন্য ব্যবহার করে নি তারা। বিছানা বালিশ নাড়াচাড়া করে আবার সুন্দর করে সেখানেই গুছিয়ে রাখছিল। এমনকি গরুর পানি খাওয়ানোর নান্দার নিচটাও ওরা এত সুন্দর করে সার্চ করে যে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। শেখ মুজিবের ছবির সামনে এসে জলপাই বাহিনীর এক অফিসার একটু থামে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে বাবাকে প্রশ্ন করে,

আপনি তো জাসদ করেন। এর ছবি রেখেছেন কেন?

বাবা বলে,

এখন আমরা যাই করি না কেন যুদ্ধের সময় তিনি আমাদের সবার নেতা ছিলেন। এমনকি যারা তাঁকে হত্যা করেছে, যিনি এখন সামরিক বাহিনীর প্রধান হয়েছেন তাঁরা সবাই তো তাঁর অধীনেই যুদ্ধ করেছি।

তা ঠিক, তা ঠিক।– জলপাই বাহিনীর অফিসারটি বুকটা আরও টান টান করে দাঁড়ায়। নিস্ফল খোঁজাখুঁজি শেষে আর সব আর্মিরা এসে তার আশেপাশে দাঁড়ায়। অফিসারটি তাদের একবার দেখে নিয়ে বাবার দিকে অর্থবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে,

বাই দ্য বাই, আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে।

আমি কি দু'চারটা টুকিটাকি জিনিসপত্র সঙ্গে নিতে পারি?

না, না। তার কোনও দরকারই হবে না। আপনি আজই ফিরে আসতে পারবেন।

বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ওরা সড়কে গিয়ে আর্মি ভ্যানে চড়ে। ভ্যানে ওঠার আগে বাবা একবার আমাদের দিকে তাকায়। আমরা তিনজন মানুষ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকি। কেবল তিনদিন আগে হাটবারে নতুন কিনে আনা গরুটা দু'তিনবার ডেকে ওঠে। বোধহয় স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করে হালিম নানাকে ডেকে এনে তার জন্যে ঘাস খড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ির এককোনে ছোট্ট কলাবাগানে, বাঁশগাছের ঝাড়ে হেমন্তের বাতাস চুপচুপ করে বয়ে এসে হঠাৎ দমকা শব্দে ডানা ঝেড়ে সারা পৃথিবী থেকে বয়ে আনা দুঃখ বেদনা আমাদের জন্যে ফেলে দিতে থাকে। আর্মি ভ্যানটা ক্রমাগত দূর থেকে আরও বহুদূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু একটুও ধূলি ওড়ে না। হেমন্তের ক্লান্ত ধুলো ডানা মেলার বদলে কেবলই উটপাখির বিশালতা ধারণ করতে থাকে নিজের কণাকৃতির শরীরের মধ্যে। আমি আমার হাতের মধ্যে মণীষার ছোট্ট

হাতের ভয়ার্ত চাপ অনুভব করতে থাকি, আমি আমার মায়ের অবয়ব ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে এমত উপলব্ধিতে নিজেও ফিনিক্স পাখি হয়ে যেতে থাকি। আমি আকাশে উড়তে থাকি, প্রতিটি ঘূর্ণনে ছাই হয়ে যেতে থাকি, বিন্দু বিন্দু ছাইয়ের আকারে ছড়িয়ে পড়ি, অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ি।

রাতে আর বাবা ফিরে আসে না। মা রান্না করলেও আমাদের ভাল করে খাওয়া হয় না। সোলায়মানের দোকানের কাছাকাছি গিয়েও আমি ফিরে আসি। ওখানে গেলেই লোকজনের নানান কথা শুনতে হবে, নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আসতে আসতে শুনি, রেডিও-তে মেজর জেনারেল জিয়া নামের কে একজন আর্মিদের ব্যারাকে ফিরে গিয়ে অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। সেই রাতে জীবনের প্রথম সিগারেটে টান লাগাই আমি। বাবার বিছানা গোছাতে গিয়ে বালিশের নিচে আবিষ্কার করি একটা সদ্য খোলা সিজার সিগারেটের প্যাকেট আর অর্ধেক শেষ হওয়া দিয়াশলাই। অনেক রাতে বাঁশঝাড়ের কাছে বসে নিজের অজান্তেই সেই সিগারেট টানতে থাকি। টানতে টানতে মনে হয় মণীষা ছাড়াও আমি আমার নিঃসঙ্গতার আরও এক সঙ্গী খুঁজে পেলাম। এই সঙ্গী বরং আরও বেশি নিবেদিত, কোনও প্রশ্ন করে না, কেবলই সহানুভূতির ধোঁয়া উগড়ায়।

বাবা ফিরে আসে পরদিন সকাল বেলায়। জলপাই বাহিনীর লোকেরাই নিয়ে আসে। তবে বাবা আর বেঁচে নেই তখন। জলপাই বাহিনীর লোকজন বলে, বাবা না কি পালানোর জন্যে হঠাৎ করে আর্মি ভ্যান থেকে লাফ দিয়েছিল। আর্মিরা তার পিছু পিছু ধাওয়া করে। বার বার ওয়াকি টকিতে থামার জন্যে নির্দেশ দেয়ার পরেও বাবা না থামায় গুলি করতে বাধ্য হয় তারা। বাবা মারা গেছে সেই গুলি লেগে। আমরা তাদের কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু প্রতিবাদও করি না। কেননা তারা সামরিক হাসপাতালের ডাক্তারের রিপোর্ট আমাদের হাতে ধরিয়ে দেয়। বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি কত বড় প্রতারণা ছিল সেটা। ময়না তদন্তের রিপোর্ট মাত্র এক রাতের মধ্যে কোনওদিনই পাওয়া যায় না। জিয়াউর রহমানের অনুগত সামরিক সেনারা তা-ও সম্ভবপর করেছিল সেবারের হেমন্তকালে। এমনকি আমরা এ প্রশ্নও করি না বাবার গায়ে এত ক্ষতচিহ্ন কেন, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে কেন, পিঠে প্যাচানো প্যাচানো দাগই বা কিসের। আমরা কোনও প্রশ্নই করি না, কেননা আমরা টের পাই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে নিয়েই কথা বলছে তারা আমাদের সঙ্গে।

আর্মিরা বলে, বাবার লাশ তারাই কবর দেবে। মুর্দা নিয়ে আমাদের কোনও কষ্ট করতে হবে না। কড়া পাহারায় বাবাকে কবর দিয়ে কবরখানায় কয়েকজন আর্মিকে তিন সপ্তাহের জন্যে পাহারায় বসিয়ে চলে যায় আর সবাই। আমরা কাঁদতেও ভুলে যাই বাবার লাশকে ঘিরে, বাবার কবরখানার ধারে বসে। আবার ভাবি একদিক থেকে ভালই হয়েছে এইভাবে বাবার কবর দেয়া হলো বলে। আর্মিরা শুধু লাশ ফেরৎ দিয়ে

গেলে নির্ঘাৎ অনেক ঝামেলা পোহাতে হত আমাদের। জানাজা করতে গিয়ে ইমাম যখন বলত, মুর্দার নামে কারও কোনও অভিযোগ আছে কি না তখন নিশ্চয়ই আমার চাচারা হাজার রকম কাহিনী আর দাবিদাওয়া ফেঁদে বসত। অথবা ইমাম সাহেবই বলে বসতেন, আপনার বাবা এতদিন এক ওয়াক্ত নামাজও পড়েন নাই। এজন্যে তাঁকে এত হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। একজন অপরিচিত লোক হয়তো দাবি করে বসত বাবা যখন আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিল তখন সে তিন হাজার টাকা ধার দিয়েছিল। এইসব নানান গ্যাঞ্জাম পাকিয়ে বসত লোকজন নিঃসন্দেহে।

শুনতে পাই আর্মিরা গাঁয়ের পর গাঁ হানা দিয়ে কাদের কাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আবারও পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে যায় আমাদের স্কুলঘর, বাজার, বিভিন্ন বাড়ির কাচারি ঘর এমনকি বটসহ বিভিন্ন গাছের মোটা গুড়িগুলো পর্যন্ত। ঝাঁকড়া চুলের যুবকদের ছবি ছাপানো তাতে। নিচে কালো কালিতে লেখা : এদের ধরিয়ে দিন। ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ পুরস্কার পাঁচশ' টাকা। সোলায়মানদের দোকানের সামনে বসে কেউ ফিসফিসিয়ে আলাপ করে শহরে একজন ঝাঁকড়াচুলো যুবককে আর্মিরা ধরার পরে পর্যাপ্ত মারধর করে অর্ধেক মাটিতে পুঁতে গুলি করে মেরে ফেলেছে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে না কি দলে দলে সেপাইরা অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল একদিন। কারা না কি জেলের মধ্যে ঢুকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। আর্মি অফিসাররা এখন বিদ্রোহী সেপাইদের ধরে ধরে ফাঁসি দিচ্ছে। আমার মঙ্গল পাণ্ডের কথা মনে পড়ে। বাবা বলত, মঙ্গল পাণ্ডেরা যুগে যুগে ফিরে আসে। অন্য কারও দেহতে ভর করে বিদ্রোহ করে। তবে কি ওরা আবার ফিরে এসেছে? কিন্তু এখন তো ইংরেজদের কেউই নেই। তাহলে ওদের কেন মারা হবে? উত্তর খুঁজে পাই না। গ্রামের শেষপ্রান্তে একটা পড়োপড়ো কুঁড়েঘরে থাকা আলী আকবরের মায়ের অস্পষ্ট কান্না আমাদের বাড়ির উঠোনকে কেবলই ভারি করে তুলতে থাকে। আর্মিরা না কি তার বাড়িতেও হানা দিয়েছিল বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে থাকা তার ছেলের খোঁজে। সে না কি পালিয়েছে আর্মি থেকে। রহিমের মা একটা চিঠি নিয়ে এসে একদিন মায়ের কাছে কাঁদতে থাকে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে তার ছেলের নামে। লিখেছে : আপনি গত একমাস যাবৎ কাজে অনুপস্থিত আছেন। অতি সত্বর কাজে যোগদান করুন, নতুবা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। অথচ রহিমের মা হলফ করে বলতে পারে তার ছেলে ছুটি নেয় নি, বাড়ি আসে নি, তাহলে কোথায় যাবে? এইসব প্রতিকারহীন অনুযোগ প্রতিদিনই আমাদের বাবার শোক ভুলিয়ে দিতে থাকে। অথবা ভুলিয়ে দেয়ার বদলে নিয়ে যেতে থাকে হৃদয়ের গভীর কোনও গহ্বরে, কোনওদিন বিসুভিয়াসের তীব্র লাভাসমেত উদ্‌গীরিত হবে বলে।

আমার সাইকেল কেনার ইচ্ছা ক্রমাগত হারিয়ে যেতে থাকে। তার ওপর ওই সময় এমন এক ঘটনা ঘটে যা আমার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু সাইকেল থেকে সরিয়ে আনে। স্কুলের এক ছুটির দিনে ঘর গোছাতে গিয়ে আমি দেয়ালের ক্যালেন্ডারের উল্টো

দিকের ফুল পরিষ্কার করার জন্যে নামাতেই চমকে উঠি। দেখি ক্যালেন্ডারের ওপরে যে গোল রিং আছে তার সঙ্গে একটি পিস্তল ঝুলছে। পিস্তলটার নলের মুখের সূক্ষ্ম বাঁকানো রিংটাকে টালমাটাল অবস্থাতেই রিং-এর সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এরকম একটা সাধারন জায়গায় পিস্তলের মতো জিনিস থাকবে তা কেইবা চিন্তা করবে! জলপাই বাহিনীর লোকেরাও করে নি। বাবা যে অবস্থায় ওটাকে রেখে গেছে সেই অবস্থাতেই রয়ে গেছে। চট করে পিস্তলটাকে কোমরে গুঁজে ফেলি আমি মণীষা কিংবা মায়ের চোখে পড়ার আগেই। একটা অন্যরকম উত্তেজনাও অনুভব করি আমি, আর তার কারণ যে পিস্তলের শক্তি তা কিন্তু নয়। আমার মনে হয় বাবা তার নিঃসঙ্গ দিনগুলোর এক সঙ্গীকে আমার জন্যে রেখে গেছে। মনে হয় বাবাই আমার কাছে চলে এসেছে। আমার রক্ত চনমনিয়ে ওঠে, শরীরের মধ্যে আলাদা উষ্ণতা অনুভব করি। সেই থেকে এক দোষও দাঁড়িয়ে যায় আমার। মাঝে মাঝেই ইচ্ছা জাগে ওটাকে নেড়েচেড়ে দেখার। আমি যে কোনওদিন ওটা ব্যবহার করব, কারও বুকে চেপে ধরে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করব কিংবা প্রতিদিনের যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে একদিন হেমিংওয়ের আলোকিত উচ্চারণের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'ম্যান ক্যান বি ডেস্ট্রয়েড বাট নট ডিফিটেড' বলতে বলতে কপালে গুলি ফুটিয়ে বসব এরকম কোনও কিছুই মনে হয় না আমার। স্রেফ ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, আর কিছু নয়। আমি তাকে সযত্নে লুকিয়ে রাখি, কখনওবা সারাদিনই কোমরে গুঁজে ঘুরে বেড়াই। ঘুরতে ঘুরতে দেখি পথ চলে গেছে কোনদিকে, কোন অজানাতে। বাবার নিচু কিন্তু স্পষ্ট কথাও শুনি হঠাৎ করে,

ওই যে রাস্তা ওটা চলে গেছে যশোর রোডে। দেখবে সারি সারি বিশাল কড়াই গাছ রাস্তার দুইধারে। চলে গেছে সোজা ভারতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এক আমেরিকান কবি এসেছিল এইখানে। তাঁর একটা কবিতা আছে এই নিয়ে – সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড। তুমি তো তখন একেবারেই ছোট। তোমার মতো শরণার্থী শিবিরে থাকা শিশুদের কথাও আছে ওই কবিতাতে।

বাবার কথা শুনতে শুনতে আমি আপন মনে বিড় বিড় করে উঠি, নিজের ভেতরে নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে থাকি :

লক্ষ শিশু দেখছে আকাশ অন্ধকার
উদর স্ফীত, বিস্ফোরিত চোখের ধার
যশোর রোডে - বিষণ্ন সব বাঁশের ঘর
ধুকছে শুধু, কঠিন মাটি নিরুত্তর।

লক্ষ পিতা ভিজছে হিমেল বৃষ্টিতে
লক্ষ মাতা দুঃখ দেখে দৃষ্টিতে
লক্ষ ভাইয়ের হৃদয় শুধু যন্ত্রণা
লক্ষ বোনের নেইকো ঘরের সান্ত্বনা।...

লক্ষ প্রাণের ঊনিশশত একাত্তর

উদ্বাস্তু যশোর রোডে সব ধূসর
সূর্য জ্বলে ধূসর রঙে মৃতপ্রায়
হাঁটছে মানুষ বাংলা ছেড়ে কলকাতায়।...

কিন্তু এখন একাত্তর নয়, এখন আমরা পেরিয়ে এসেছি পচাত্তরও। এখন আর পথে রাজপথে মৃত মানুষ পড়ে না, নালার ভেতর গলাকাটা লাশ দেখে আমরা আর দৌড়াই না উর্দ্ধশ্বাসে, খেতের মধ্যে লাশের সারি দেখে এখন আর মণীষা বমি করে না হড়হড়িয়ে। কিন্তু এখনও মৃত্যু ঘটে, ঘাতকের থাবা কেড়ে নেয় আগের মতো ধড়, মুণ্ডু। তফাৎ এই লাশগুলো আর নালায়, খেতে কিংবা রাস্তায় পড়ে থাকে না। সযত্নে তাদের কবর দেয়ার পরে পাহারা বসানো হয় কবরস্থানে, কিংবা গুম করে দিয়ে তাদেরই আত্মীয়স্বজনের কাছে নিরীহ গলায় খোঁজ নেয়া হয়, কোথায় গেছে অমুক। আর আমি ঘুরেফিরে এই বাংলাতেই ঘুরতে থাকি, এতই হতভাগ্য যে বাংলা ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে যে অন্য কোথাও চলে যাব তার কোনও পথ বা উপায় খুঁজে পাই না।

সিগারেট খাওয়া তাই বেড়ে যায় আমার, পুরোদস্তুর অভ্যস্ত হয়ে উঠি। সবাই শুয়ে পড়লে আমি বারান্দায় এসে কিংবা বাঁশবাগানে গিয়ে সিগারেট টানতে টানতে নিজের ভবিতব্য চিন্তা করি। বাবা মারা যাওয়ার পরে মায়ের খুব ভয় ছিল জায়গাজমি বেদখল হয়ে যাবে। সব জমি তো চিনিও না আমরা। দেখা যাবে যে বর্গাদার হালচাষ করে সেই চুপচাপ নিজের জমি হিসাবে চাষাবাদ করা শুরু করেছে। কিন্তু বাস্তবে সেরকম হয় না। গ্রামের লোকজন অতিশয় সরল এই চিরকালীন প্রবাদ কমেডি হয়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে। প্রতিদিন আমরা উপলব্ধি করি এই সরল মানুষগুলোর কুটিলতা। এক বর্গাদার আরেক বর্গাদারের নামে কথা লাগাতে গিয়ে, আরেকজনের কাছে থেকে জমি ছাড়িয়ে তাকে জমি বর্গা দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে কদর্য ভাষায় আমাদের কাছে বলে চলে নানান কথা। আমাকে আর কষ্ট করে খোঁজ নিতে হয় না; ওদের কথাবার্তা থেকেই উদ্ধার করে ফেলি কার কাছে কোন জমি আছে, সে জমি কতটুকু, শেষবার কোন ফসল বোনা হয়েছিল তাতে।

একদিন ঠাটা দুপুর বেলা বাড়ি ফিরে দেখি, বড় চাচা এসেছে। চাচাদের কাউকেই কখনও আমাদের বাড়িতে আসতে দেখি নি, যেমন আমিও কখনও যাই নি তাদের বাড়ি। এমনকি রাস্তাঘাটে দেখা হলেও কখনও কথাবার্তা হয় নি আমাদের মধ্যে। বাবা মারা যাওয়ার পরেও তাদের কেউ আসে নি আমাদের খোঁজখবর নিতে। তারা যে আসবে না সেই মানসিক প্রস্তুতি ছিল বলেই আজ আমি বিস্মিত হই চাচাকে দেখে। চাচা বসেছিল ঘরের বারান্দায় হাতলওয়ালা চেয়ারটাতে। মাকে দেখি রান্নাঘরের দরজার চৌকাঠে বসে। সম্ভবত তারা কোনও কথাও বলছিল। আমাকে দেখে মা রান্নাঘরের ভেতরের দিকে চলে যায়, বড় চাচা উঠে দাঁড়ায়। ঘরের ডোয়ার মাটি কেটে তৈরি করা সিড়ি বেয়ে উঠোনে নেমে আসে,

ভাইস্তা আমার—

যেন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে কোনও দুয়ার খোলা মহাআবেগে। চাচা আমাকে এমত সম্বোধন করার পরে বেশ কিছুক্ষণ জড়িয়ে রাখে। তারপর বলতে থাকে,

আমাকে চিনতি পারবে না। চিনার কথা না। আমি তোমার বড় চাচা। ভাবছিলাম কুন দিন আসবো না। কিন্তু রক্তের টান বুঝলে? রক্তের টান মোছা যায় না। ভায়ে ভায়ে বিবাদ বিসম্বাদ করে আমরা আমাগের সুমায় নষ্ট করে ফেলিছি, কিন্তু তার মাশুল তোমরা কেন দিবে?

চাচা এভাবে অনেক কথাই বলে। সব কথা আমার কানে ঢোকে না। কেন জানি মনে হয় যে জগতের, যে বন্ধনের, যে নির্ভরতার মাধুরিমা থেকে বাবা আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, - যে রক্তের, যে পরিবারের, যে ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য থেকে বাবা নিজেই আমাকে মুক্ত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সেই মাধুরীতে সেই ঐতিহ্যে আমার আর গ্রন্থিত হওয়ার কোনও-ই সুযোগ নেই। আমি তাই নিজেকে ছাড়িয়ে নেই, শান্ত কণ্ঠে বলি,

বসেন চেয়ারটাতে বসেন।

আর বসাবসির কি আছে ভাতিজা? চল আ'জ সবাই মিলে আমার বাড়ি, দানাপানি যা আছে সবাই মিলঝিল করে খাওয়াদাওয়া করি।

আমি হেসে ফেলি। হাসতে হাসতে আমার স্কুলের পাঠ্যবইয়ের কবিতার কথা মনে পড়ে। পুত্রের ঘাতক আশ্রয় নিয়েছে অসহায় অবস্থাতে না জেনে না শুনে পিতার বাড়ি,- যে পিতা প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ছে অহর্নিশি। ঘাতকের পরিচয় জানার পরেও সে সঙ্গীন তোলে নি ঘাতক তার অতিথি বলে। কবিতার পিতার মতো আমিও মিষ্টভাষী হওয়ার চেষ্টা করি,

যাব। যাব একদিন। আজ আপনি এসেছেন, মেহমান মানুষ, একটু আপ্যায়ন করার সুযোগ দেন।

ভাতিজার কী সুন্দর ব্যবহার! সম্পর্ক না থাকলি কি হবে, দেখতি হবে না বংশের ধারা কেমন?

আমি ভেবেছিলাম এরপর বড় চাচা বংশের ফিরিস্তি দেয়া শুরু করবে। কিন্তু সেদিকে মোটেও পা বাড়ায় না সে। বাড়িঘরের খোঁজখবর নিতে থাকে। কোন ফসল কেমন হলো, জমিজমার অবস্থা কি, বর্গাদাররা ঠিকমতো চাষবাস করে কি না এইসব খেজুঁরে গল্প। আলাপের ধারা কোন দিকে গড়িয়ে চলে আমি তা টেরও পাই না। যখন টের পেলাম তখন আর ক্ষান্তি দেয়ার কোনও উপায় নেই। বড় চাচা আমাকে নানা পরামর্শ দেয়া শুরু করে। বাবা যে সব ভুল করেছে আমি যেন সেসব করতে না যাই,

যেন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে কোনও দুয়ার খোলা মহাআবেগে। চাচা আমাকে এমত সম্বোধন করার পরে বেশ কিছুক্ষণ জড়িয়ে রাখে। তারপর বলতে থাকে,

আমাকে চিনতি পারবে না। চিনার কথা না। আমি তোমার বড় চাচা। ভাবছিলাম কুন দিন আসবো না। কিন্তু রক্তের টান বুঝলে? রক্তের টান মোছা যায় না। ভায়ে ভায়ে বিবাদ বিসম্বাদ করে আমরা আমাগের সুমায় নষ্ট করে ফেলিছি, কিন্তু তার মাশুল তোমরা কেন দিবে?

চাচা এভাবে অনেক কথাই বলে। সব কথা আমার কানে ঢোকে না। কেন জানি মনে হয় যে জগতের, যে বন্ধনের, যে নির্ভরতার মাধুরিমা থেকে বাবা আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, - যে রক্তের, যে পরিবারের, যে ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য থেকে বাবা নিজেই আমাকে মুক্ত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সেই মাধুরীতে সেই ঐতিহ্যে আমার আর গ্রন্থিত হওয়ার কোনও-ই সুযোগ নেই। আমি তাই নিজেকে ছাড়িয়ে নেই, শান্ত কণ্ঠে বলি,

বসেন চেয়ারটাতে বসেন।

আর বসাবসির কি আছে ভাতিজা? চল আ'জ সবাই মিলে আমার বাড়ি, দানাপানি যা আছে সবাই মিলঝিল করে খাওয়াদাওয়া করি।

আমি হেসে ফেলি। হাসতে হাসতে আমার স্কুলের পাঠ্যবইয়ের কবিতার কথা মনে পড়ে। পুত্রের ঘাতক আশ্রয় নিয়েছে অসহায় অবস্থাতে না জেনে না শুনে পিতার বাড়ি,- যে পিতা প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ছে অহর্নিশি। ঘাতকের পরিচয় জানার পরেও সে সঙ্গীন তোলে নি ঘাতক তার অতিথি বলে। কবিতার পিতার মতো আমিও মিষ্টভাষী হওয়ার চেষ্টা করি,

যাব। যাব একদিন। আজ আপনি এসেছেন, মেহমান মানুষ, একটু আপ্যায়ন করার সুযোগ দেন।

ভাতিজার কী সুন্দর ব্যবহার! সম্পর্ক না থাকলি কি হবে, দেখতি হবে না বংশের ধারা কেমন?

আমি ভেবেছিলাম এরপর বড় চাচা বংশের ফিরিস্তি দেয়া শুরু করবে। কিন্তু সেদিকে মোটেও পা বাড়ায় না সে। বাড়িঘরের খোঁজখবর নিতে থাকে। কোন ফসল কেমন হলো, জমিজমার অবস্থা কি, বর্গাদাররা ঠিকমতো চাষবাস করে কি না এইসব খেজুঁরে গল্প। আলাপের ধারা কোন দিকে গড়িয়ে চলে আমি তা টেরও পাই না। যখন টের পেলাম তখন আর ক্ষান্তি দেয়ার কোনও উপায় নেই। বড় চাচা আমাকে নানা পরামর্শ দেয়া শুরু করে। বাবা যে সব ভুল করেছে আমি যেন সেসব করতে না যাই,

বাবার মতো যেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ না তাড়াই এইসব পরামর্শ। আমাকে এখনই কঠোর হতে হবে, না হলে বাবার সম্পত্তি রক্ষা করতে পারব না, এইসব বলতে থাকে চাচা। আমি শুধু শুনেই চলি। একসময় আস্তে আস্তে কথা বলার ভঙ্গিতে বড় চাচা

বলে, পরের ঘরের এই দুটো মেয়ে পুষে আমি যেন আর চালডাল নষ্ট না করি। বাবার তো দ্বিতীয় পক্ষের কোনও ছেলেপুলে নেই যে সম্পত্তিতে হক জন্মাবে ওদের। মণীষা-ও তো আপন বোন না আমার। অতএব আমার কি দরকার তাদের পেছনে খরচাপাতি করার, কি দরকার তাদের এই বাড়িঘরে থাকতে দেয়ার। চাচা এসব বলে আর আশেপাশে এমন করে তাকাতে থাকে যে বাড়িতে আর কেউ নেই, কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে চলে আসতে পারে, সেজন্যে রাস্তার দিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আবার বলার ভঙ্গিতে ফিসফিসানি নিয়ে এলেও এত জোরে বলতে থাকে যেন মা কিংবা মণীষা সহজেই তার কথা শুনতে পারে।

তারপর চাচা চুপ করে বসে থাকে। আমি বুঝে নেই চাচা আসলে এটুকুই বলতে এসেছে। সরাসরি বলা যায় না, তাই গৌরচন্দ্রিকা টানার নানা চেষ্টা। একবার কল্পনা করার চেষ্টা করি চাচার সঙ্গে সত্যি সত্যি আজ দুপুরে আমরা যদি চলে যেতাম তাহলে সে কি করত। যেসব কথা এখন বসে বসে আমাকে শুনিয়ে গেল তা কি বলার সুযোগ পেত? না কি চাচা আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করত? অথবা চেষ্টা করত আমাদের মধ্যে অন্যভাবে ঘুণ ধরাতে? তাহলে এখন কি চাচা আসলে টের পেয়ে গেছে আমি কোনওদিনই তার বাড়ি যাব না? তাই শেষ পর্যন্ত আজই বলে ফেলতে হলো মণীষা আর ওর মাকে খরচের খাতায় লিখে ফেলার কথা? কিংবা এ চিন্তাও কি চাচা করে আসে নি আমি যদি মণীষাদের খরচের খাতায় না-ও লিখি এসব কথা শোনার পর থেকে ওদের তাড়িয়ে ফিরবে যে কোনও সময় উচ্ছেদ হওয়ার আশংকা?

একসময় চাচা উঠে দাঁড়ায়, বলে,

ঠিক আছে, আমি যাই। ভাবনা চিন্তা করে দেখ হাতি পুঁষবে না সম্পত্তি রক্ষা করবে।

আমি কিছু বলি না। এমনকি তাকে বিদায় দেয়ার জন্যে পিছু পিছুও যাই না সামান্য রাস্তা। চাচা সড়কে গিয়ে উঠেছে দেখে আমি ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকি একটু শোব বলে। দেখি মণীষা বাবার খাটের একটা প্রান্ত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখমুখ ভারি হয়ে উঠেছে ওর। আর সারা শরীরে যেন অবসন্নতা নেমে এসেছে। নিজের অজান্তেই ও এগিয়ে আসে, আমিও এগিয়ে যাই নিজের অজান্তে।

তুমি আমাদের তাড়িয়ে দেবে?

ওর কণ্ঠ করুণ হয়ে আসে। আমরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরি। আমাদের কথা বলার ভাষা শেষ হয়ে আসে এবং আমরা নতুন করে শরীরী স্পর্শের আবর্তে বোধগম্য ভাষা তৈরির চেষ্টা করি। মণীষা আমাকে ছেড়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে, অনেকদিন একসঙ্গে থাকার পরে মানুষ যেমন হঠাৎ করে একদিন সম্পর্কহীনতা আবিষ্কার করে কখনও ক্রন্দনমুখর কখনওবা বোবা হয়ে যেতে থাকে তেমনি করে মণীষাও ফুঁপিয়ে ওঠে, আবার বোবা হয়ে পড়ে। পেছন থেকে বৃত্ত তৈরি করে আমি কখনও স্পর্শ দিয়ে কখনও কথা বলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি আমাদের সেই অতীতী নির্ভরতা। মণীষা হঠাৎ প্রচণ্ড আবেগে কাঁদতে থাকে নিজেকে আমার মধ্যে সমর্পিত করে। আর তখনই আমি আমার ভেতরের অন্য এক আমিকে অবলোকন করি। আমার সারা শরীর হঠাৎ আবেগে ও উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে, আমার শিশ্ন উত্থিত হয় সচেতন আমার আদেশকে অমান্য করে, ভেতর থেকে কেউ বলতে থাকে আরও প্রবলতায় ওকে আমার ভেতরে টেনে নিতে, এবং আমি তাই করতে থাকি; মণীষা আমার হাতের ডানার বিবরে লীন হতে থাকে, যেমন পাখির ছানা উষ্ণতা নিতে ধীরে ধীরে নিজেকে ঠেলে দেয় পালকের অন্ধকারে। আমি আমার এই আবেগ আর উত্তেজনাকে মরিয়া হয়ে থামাতে চেষ্টা করি, দু'উরুর অভ্যন্তরে প্রাণপণে চেপে ধরে লুকিয়ে রাখতে চাই উত্থিত শিশ্ন আর শিশ্নের আকাঙ্ক্ষাকে; কিন্তু বুঝতে পারি আমি আমাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছি অন্য কোনও অনুভবে, আমার ঠোঁট নাক গাল কামনার অধীরতা নিয়ে মণীষার ঠোঁট নাক গালে সান্ত্বনার প্রতিবিম্ব তৈরি করছে, তলপেটের জমিনে মণীষার নিতম্ব নির্বাক কোমলতা দিয়ে আমার উরুর মধ্যে আটকে রাখা শিশ্নকে ঔদ্ধত্য দেখানোর জন্যে ডাক দিচ্ছে আর আমার উরুদেশ ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে মিশে যাচ্ছে মণীষার নিতম্বের সঙ্গে। হঠাৎ আমি অনুভব করি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নেমে এল, কোথায় যেন একটা পাখি উড়ে গেল, বাঁধ ভেঙে গেল একটা নদীর। মণীষার চুলের মধ্যে আমার হাতের আঙুলগুলো কেঁপে কেঁপে উঠল, ঠোঁট আপনাআপনি নড়তে লাগল,

তোদের আমি কোথাও যেতে দেব না।

আমাদের দুজনের শরীরই এবার হঠাৎ একবার শক্ত হয়ে উঠল, তারপরই ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো, আমরা অবসন্নতা আর উদ্দীপনা দুটোকেই একসঙ্গে ধারণ করে বাবামা'র খাটটার একধারে পাশাপাশি বসে রইলাম।

আমি জানি না মণীষা আমার এই স্খলন টের পেয়েছে কি না। হয়তো একদম বোঝে নি, বোনরা কাঁদলে ভাইরা তো এরকম কাছাকাছিই চলে আসে; অথবা টের পেয়েছে, কিন্তু কিছু বলে নি, কেননা মানুষ শেখে এইরকমই হঠাৎ করে, এরকম কার্যকারণহীনতার মধ্যে দিয়েই সে উপলব্ধি করে অপর স্বত্ত্বাকে, তারপর তাকে সামাজিক কার্যকারণের সঙ্গে মিলিয়ে সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতা বিচার করে হয়তোবা আবারও কাছাকাছি আসে কিংবা চলে যায় নিরাপদ অন্য কোথাও। মণীষার আচরণে আমি তাই অন্য কোনও ইঙ্গিত খুঁজে পাই না। আমিও আমার এই প্রথম জ্বলে ওঠাকে সংগোপনে লুকিয়ে ফেলি।

জ্বলে ওঠা আমি লুকিয়ে গেলেও বাইরের পৃথিবীতে সূর্যের তেজ বাড়তেই থাকে ক্রমাগত। অথচ আমাদের স্কুলে নির্বিবাদেই ভোট হয়ে গেছে। যুবকবয়সী তোজাম্মেল লিডার বনে গেছে এই সুযোগে। দলবল নিয়ে হ্যাঁ মার্কা ব্যালটপেপার সে এত বেশি ফেলে যে ভোটারের সংখ্যার চেয়েও বেশি ভোট পড়ে যাওয়াতে কিছু ভোট আবার গণনার পরে গায়েব করতে হয়। হ্যাঁ/না কিংবা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে না হলেও সংসদ নির্বাচনের সময় আমি প্রথমবারের মতো ভোট দিতে শিখি। ভোটার হওয়ার আগেই ভোট দেয়ার সুযোগ করে দেয় আমাদের স্কুলের এ্যাথলেট কুদ্দুস। কুদ্দুসের বয়স কত তা আমরা কেউই বলতে পারব না। তাকে কখনও পরীক্ষাও দিতে হয় না। তার কাজ একটাই : আন্ত:স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় স্কুলের হয়ে সবগুলো আইটেমে প্রথম হওয়া এবং চ্যাম্পিয়নশীপের মেডেল ছিনিয়ে আনা। কিংবা ফুটবল খেলার স্ট্রাইকার হিসাবে কয়েকটা গোল করে স্কুলের শিল্ড পাওয়া নিশ্চিত করা। তাতে স্কুলের অনুদান পাওয়ার রাস্তা না কি ক্লিয়ার হয়ে যায়। স্যারদের কাছে তাই কুদ্দুসের গুরুত্ব অন্যরকম।

ভোটের দিন আমি স্কুলের কাছে ঘুরঘুর করছিলাম আর দেখছিলাম কে কি করে। কুদ্দুস হঠাৎ ডাক দেয় আমাকে,

কি রে ভোট দিবি?

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই একটা স্লিপে কি একটা নাম্বার আর নাম লিখে ধরিয়ে দেয় আমার হাতে। আমি সেটা নিয়ে ভোটঘরে ঢুকে পড়ি। দেখি তোজাম্মেল ভায়ের লোকজন পুরো ভোটকেন্দ্রই দখল করে রেখেছে, হাতাকাটা কালো কোট কিংবা পাঞ্জাবি টুপি পরা কাউকেই কোথাও দেখা যাচ্ছে না। প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে স্লিপটা এগিয়ে দিতে গেলেই তোজাম্মেলদের দলবলের একজন এগিয়ে আসে এবং ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয় সেটা। তারপর স্লিপটা দেখে 'ও, কুদ্দুস পাঠাইছে' বলে আবারও ফিরিয়ে দেয়। আমি সেটা প্রিসাইডিং অফিসারের হাতে দিলে তিনি ভোটার

লিস্টে মিলিয়ে দেখেন, টিক চিহ্ন কাটেন এবং ব্যালট পেপার এগিয়ে দিতে দিতে স্মিতমুখে বলেন,

তোমার বয়স তাহলে ভেপ্পান্ন!

শুনে আমার খুবই লজ্জা করে। আমি কোনওমতে বুথে ঢুকে পড়ি। কে যেন বলে, বুথে ঢুকে আর কি করবে, এখানেই সিল দিয়ে ফেল। আমি শুনেও না শোনার ভান করি। ব্যালট পেপারটা বাক্সে ঢুকাতে ঢুকাতে দেখি, মৌলভী স্যার খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে কি যেন বলাবলি করছে প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে। কথা বলার সময় তার বুকের ছাতি দম নেয়াতে এত বেশি ফুলে উঠছে যে বুকপকেটে লাগানো দাঁড়িপাল্লার মনোগ্রামটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বের হতে হতে শুনি মৌলভী স্যার বলছে,

আমার ভোট দিয়ে দিয়েছে, আমাদের পোলিং এজেন্টকে বের করে দিয়েছে। আর আপনি বলছেন কিছুই করার নেই। এটা কি মগের মুল্লুক না কি? এই জন্যে কি জিয়া সাহেবকে সমর্থন দিছিলাম আমরা হ্যা/না আর রাষ্ট্রপতি ভোটের সময়? আমি– আমি লিখিত অভিযোগ করব।

আমি দেখি কোথা থেকে কুদ্দুস এসে হাজির হয়েছে সেখানটায়। মৌলভী স্যারকে দেখেও না দেখার ভান করে সে কথা বলা শুরু করে,

কি ব্যাপার প্রিসাইডিং ছার, এত হাউকাউ কিসের? আপনারা কি ভোট সুষ্ঠুভাবে হ'তে দেবেন না? সখ হল একজন আ'সে বলল আমার ভোট আরেকজনে দিয়ে গিয়েছে, আর আপনি তাই নিয়ে ঝাপায়ে পড়লেন? চিল কান নিয়ে গেছে শু'নে চিলের পিছে পিছে দৌড়ালে চলে না কি?

মৌলভী স্যার তার আদুভাই মার্কা ছাত্রকে দেখে বেশ খুশি হয়ে ওঠে, কুদ্দুসকেই সাক্ষী মেনে কথা বলা শুরু করে পুনরুদ্যমে,

দেখ না বাবা কুদ্দুস। কি অনাচার বল তো দেখি, তোজাম্মেলের এইগুলো করা কি ঠিক হচ্ছে? আমার পোলিং এজেন্ট বের করে দিয়েছে, আমার ভোটটাও আরেকজনকে দিয়ে সিল মারার বন্দোবস্ত করেছে..

অ, আপনের ভোট দিয়ে ফেলেছে? স্যার, এত বয়স হলো, এতবার ভোট দিলেন, এখনও ভোট দেয়ার হাউস গেল না আপনের! ঠিক আছে, দেখেন কার ভোট ফিরি আছে, আপনে মানি মানুষ, আপনেগ আর না করি কেমনে। যান, যার ভোট ফাঁকা আছে তার ভোট দিয়ে আসেন।

এইটা তুমি কি বল বাবা? আরেকজনের ভোট আমি দেব কেন? আমার ন্যায্য ভোট কে না কে দিয়ে গেল সেটা দেখবে না তুমি?

কুদ্দুস হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে,

আবে শালা রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার, বসতে দিলে শুইতে চায়! তোজাম ভাই এইগুলোরে লাই দিয়ে মাথায় তু'লছে। আরে চোদনাকাটি, ভোটে যদি আওয়ামী লীগ জেতে তোগের কোন ভাতার বাচাবে হিসেব রাখিস?

মৌলভী স্যারের মুখ চুন হয়ে যায়। আর একটাও কথা বলে না। কুদ্দুস বীরদর্পে তার সামনে দিয়ে বের হয়ে আসে। আমার চোখে চোখ পড়তেই বলে,

চল, চা খায়ে আসি।

ভোট উপলক্ষে রাস্তার ধারে বসানো ক্যাম্প-কাম-চায়ের দোকানে বসি আমরা। কুদ্দুস আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে চায়ের অর্ডার দেয়। বলে,

শোন, তোকে যে এত খাতির করছি তার কারণটা কি জানিস?

আমি মাথা নাড়ি। কুদ্দুস মিটিমিটি হাসে,

খুপ সিক্রেট। খুপ সুন্দর ক'রে আমার একটা জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করে দিবি। তোজাম ভাই কয়াছে লিবিয়া পাঠায়ে দিবে। ফারুক ভাই, নাম তো শুনছিস, শুনিস নাই এগোনো? আরে, ওই যে মুজিবেক মাডার ক'রলো না? তার বডিগাড হব। তোজাম ভাই কয়াছে আমার মতো শিলকাঠের মতো বডিঅলা ছেলে দরকার তার। কয়েক বছর থাকতি পারলেই কোটি কোটি টাকা। ফিরে আ'সে এম পি ইলেকশন করব। টাকা হ'লে কাঠের পুতুলও হাও করে। ঠিকই জিতে যাব।

আমরা চুপচাপ চা খেতে থাকি। কুদ্দুস আবারও বলে,

কাজটা ঠিক হলো না রে। আমরা নয় চোদনা ছেলে। লুইটেপুইটে খাই। তুই এত ভাল একটা মানুষের পোলা, তোকে দিয়ে এইরকমভাবে ভোট দেওয়ালাম, মনের মধ্যে ঠিক সায় দিচ্ছে না। যা সুন্দর করে তোর বাবা কথা বলত! মনটা ভরে যেত। সে থাকলে ঠিকই জাসদ করতাম আমি। আমাকে আদর করে কি ডাকত জানিস? মিস্টার কুদ্দুস। বলত, মিস্টার কুদ্দুস খেলা হল শরীরের খাদ্য আর পড়া হল মনের খাদ্য। খালি খেলাধুলা করলে তো চলবে না মিস্টার। আমাকে দিয়ে সবাই খেলাতি চায়, তোর বাপের মতো কেউ চায় নাই আমি লেখাপড়াও করি। তা এগন আর কি! এগন তো সবই শেষ। বেটার লিবিয়া চলে যাব।

বাবা না থাকায় এভাবেই যোগাযোগ আর পরিচিতির বৃত্ত আমার বাড়তে থাকে। আমি অবাক হয়ে দেখি, এইসব মানুষগুলো চায় না আমি বাবার বৃত্তের বাইরে এসে দাঁড়াই, বাবার আচরণ থেকে পৃথক কোনও আচরণ করি। অথচ তারা নিজেরা কখনও-ই ওরকম আচরণ করতে চায় না। কিংবা করতে চায়, সাহস পায় না, তাই সামনের

সারিতে কাউকে দেখতে চায়, যার ওপর ভরসা করে সেরকম আচরণ করা যাবে। বাবা একজন সেরকম মানুষ। তারা বাবার ছায়া খুঁজে ফেরে আমার ভেতর।

ছায়া খুঁজে ফেরা এইসব মানুষজনকে আমি তাই পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি। এরা জানে না মূল গাছ মরে গেলে ছায়াও মরে যায় একই সঙ্গে, তখন আর সেই ছায়া খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের এড়িয়ে আমি চুপচাপ স্কুলে যাই, ফিরে আসি চুপচাপ। তারপরও অঘটন ঘটে যায় একদিন। স্কুলে টিফিন পিরিয়ডের আগে সেদিন কয়েকজন পাঞ্জাবি পরা ছেলে আসে। সবারই আবার একটু একটু দাড়ি আছে। হেলাল স্যার আমাদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। ছেলেগুলো বলে, তারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ইসলামী সংগঠন করে। আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলার জন্যে স্যারের কাছে থেকে তিন মিনিট সময় প্রার্থনা করে তারা। স্যার অনুমতি দিলে বলে, আমাদের সঙ্গে তারা একটু কথা বলবে টিফিন পিরিয়ডে। ওই সময় প্রতিটা ক্লাসে যারা প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় হয়েছে তাদেরকে তারা সংগঠনের পক্ষ থেকে কাগজ কলম ক্যালেন্ডার এইসব হাবিজাবি জিনিসপত্র দেবে। যারা প্রথম হয়েছে তাদের এছাড়া বই কেনার জন্যে নগদ টাকা দেয়া হবে।

আমরা খুব উৎসাহ আর কৌতূহল নিয়ে টিফিন পিরিয়ডে সমবেত হই সবচেয়ে বড় ক্লাসঘরটাতে। আমার জন্যে বিষয়টি খুবই সুখকর ছিল, কেননা আমি আবার আমার ক্লাসের প্রথম ছাত্র। ক্লাসের বই আমি অনেক আগেই কিনে ফেলেছি। এদের দেয়া টাকাগুলো নিয়ে কি করব তাই চিন্তা করি। তারপর ঠিক করি যে সামনের রবিবারে স্কুল বন্ধের দিনে সকালের ট্রেনে চড়ে খুলনা গিয়ে পিকচার প্যালেসের সামনের দোকান থেকে 'আমি সুভাষ বলছি' বইটা কিনে ফেলব; মণীষার জন্যে কিনব আহমদ ছফার অনুবাদ করা 'তানিয়া' কিংবা ননী ভৌমিকের অনুবাদ করা 'বাবা যখন ছোট'। ভার্সিটি পড়ুয়া ছেলেগুলো কি বলবে তা শোনার জন্যে, কিভাবে কাগজ কলম দেবে তা দেখার জন্যে বেশ ভিড় জমে যায়। যে ছেলেটির দাড়ি সবচেয়ে বেশি ঘন সে আমাদের সবার উদ্দেশ্যে কথা বলতে থাকে। আমরা জানতে পারি আমাদের সাচ্চা মুসলমান হয়ে উঠতে হবে। কেননা আমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। আমরা যদি আল্লাহর ওপর পুরোপুরি ভরসা রেখে, দীনের পথে থেকে ঠিকমতো লেখাপড়া করি তাহলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব, পিতামাতার মুখে হাসি ফোটাতে পারব, সমাজের দশজন মানুষের কাজে লাগব এমনকি পরকালে আমাদের আল্লাহতায়ালা বেহেশ্‌ত্ নসীব করবেন। আর সেজন্যেই আমাদের ঠিকমতো নামাজকালাম পড়তে হবে, মুরুব্বিদের কথামতো চলতে হবে, তাদের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলতে হবে। যাতে আমরা ঠিকমতো এসব কাজ করি সেজন্যে একটা কমিটি করে দিতে চায় তারা বিভিন্ন ক্লাসের ভাল ভাল ছাত্রদের সমবায়ে। আমরা সবাই একসঙ্গে নামাজ পড়তে যাব, মিলাদ পড়তে যাব, কেউ মারা গেলে কবর দিতে যাব,– এইসব নানান ধর্মীয় কাজ করব।

এমনকি পরস্পর পরস্পরের লেখাপড়ার খোঁজ নেব, যে ঠিকমতো পড়ালেখা করতে পারছে না তাকে সাহায্য করব। আর এই জন্যে আমাদের এই সংগঠনের নাম হবে ইসলামী ছাত্র শিবির। কেননা আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী, কেননা আমরা লেখাপড়া করি, কেননা আমরা এই ছাত্ররা একই শিবিরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। আমরা কোনও রাজনীতি করব না, ধর্মকর্ম আর লেখাপড়া করব আর দেশের সবাই যাতে সাচ্চা ও সৎ মুসলমান হয়ে ওঠে, তারা সবাই যাতে ইসলামের আইনকানুন মেনে চলে তার জন্যে মনেপ্রাণে কাজ করে যাব।

তারা যখন এইসব কথাবার্তা বলছে তখনই হঠাৎ আমার মনে পড়ে গতকাল সন্ধ্যায় সোলায়মানের দোকান থেকে গুড় কিনেছিলাম। যে প্যাকেটটায় সোলায়মান গুড় দিয়েছিল সেটা বানানো হয়েছিল সাপ্তাহিক বিচিত্রার পাতা দিয়ে। আর ওই পাতাগুলোতে ছিল একটা প্রতিবেদনের অংশবিশেষ। প্রতিবেদনটা লেখা হয়েছিল এই ইসলামী ছাত্র শিবির নিয়েই। বাড়িতে যেয়ে সব গুড় কৌটায় তুলে কোনও কাজ না থাকায় প্যাকেটটা ছিঁড়ে সেটা পড়েছিলাম আমি আর মণীষা। স্বাধীনতার আগে না কি এই সংগঠনটারই নাম ছিল ইসলামী ছাত্র শক্তি। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তারা, যোগ দিয়েছিল কেউ আলবদরে, কেউবা আবার আলশামস কিংবা রাজাকারে। সেটার কথা মনে হতেই আমি চেঁচিয়ে উঠি,

আপনারা তো রাজাকার ছিলেন!

চাপ দাড়িওয়ালা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এই স্কুলে এরকম কথা শোনার জন্যে বোধহয় তারা একেবারেই তৈরি ছিল না। কিন্তু একেবারে থেমে যায় না তারা। ছাগলে-দাড়িওয়ালা ছাত্রটা চাপদাড়িওয়ালাকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে কথা বলা শুরু করে,

এই কথা তোমাকে কে বলেছে ছোট ভাই?

শুনে আমার জেদ চেপে যায়,

কে বলেছে সেটা বড় কথা নয়। সত্যি কি না তাই বলুন।

দেখ ছোটভাই, আমাদের এই ইসলামী ছাত্র শিবির প্রতিষ্ঠিতই হলো গেল কয়েক বছর আগে, আর যুদ্ধ হয়েছে একাত্তরে। আমরা রাজাকার হব কেমন করে? আর ওসব তো পলিটিক্যাল ব্যাপার, আমরা তো রাজনীতি করি না।

আপনারা রঙ পাল্টেছেন। আপনারা রাজাকার ছিলেন।– আমি গড়গড় করে বলতে থাকি– এখন সংগঠনের নামও পাল্টেছেন যাতে লোকজন ক্ষেপে না ওঠে। রাজাকারদের যে আদর্শ ছিল আপনাদেরও একই আদর্শ, আপনারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা

করছেন। আপনারা যদি এখানে বেশি কথা বলেন আপনাদের আমি গুলি করে মেরে ফেলব।

আমি আজও চিন্তা করে পাই না কেন আমার মুখ দিয়ে সেদিন এমন কথা বেরিয়ে গিয়েছিল। তেমন সাহসী আমি তো কোনও সময়েই ছিলাম না। অথবা এটাই কি সত্যি যে অনেকদিন ধরে আমার মনের মধ্যে যেসব ক্ষোভ জমা হচ্ছিল তাই সেদিন বেরিয়ে এসেছিল অপর কোনও ঘটনাকে ভর করে? গুলি করে মেরে ফেলার কথা বলার পরেই আমি আমার অবচেতনে বাবার পিস্তলের উপস্থিতি অনুভব করি। ইহজাগতিকতা আমার অস্তিত্বকে গ্রাস করে এবং কেউ আমাকে অস্ত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেব তা নিয়ে আতংকিত হয়ে পড়ি। কিন্তু আমি দেখি, কেউ আমাকে কোনও প্রশ্ন করে না, বরং তারাই আতংকিত হয়ে পড়ে। আমাদের এলাকাটা এমনিতেই রাত বাহিনীর স্বর্গরাজ্য, তাদের ঠ্যাঙানোর জন্যে আবার একসময় প্রায় জায়গাতেই রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প বসানো হয়েছিল, হুদুরিগুদুরি পাতিনেতা চেলানেতা সরকারি দলের প্রায় সবাইকেই অস্ত্র দেয়া হয়েছিল। জান বাঁচাতে জাসদের ছেলেরাও অস্ত্র রাখত কাছে। এখনও অনেকের কাছেই অস্ত্র আছে। আমার হুমকিকে তাই তারা একেবারেই ফেলে দিতে পারে না। কমিটি না করে, পুরস্কার না দিয়েই চলে যায় শিবিরের ছেলেগুলো। যাওয়ার আগে কোনওমতে বলে,

ছোট ভাই তোমার কথাগুলো ঠিক না আসলে। তুমি কমিটি করতে দেবে না, ঠিক আছে আমরা চলে যাচ্ছি, কিন্তু নামাজটা ঠিকমতো পড়বে ভাই।

নামাজ আমার কোনওদিনই পড়া হয় নি, আর আমার কথাই যে ঠিক তা পরে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। শিবিরের ছেলেগুলোকে সেদিন ওভাবে ফিরিয়ে দেয়ার পরে সবচেয়ে খুশি হতে দেখি গেম স্যারকে। তিনি এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে শুরু করেন যেন আমি তাঁর সমবয়সী। একদিন বাজারে আমাদের পুরানো চেয়ারম্যান জমশেদ আলী হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। এবারের ইলেকশনে জমশেদ চাচা তোজাম্মেল মিয়ার কাছে হেরে গেছে। তোজাম্মেল ভাই অনেক ইয়াং ছেলেপেলে জড়ো করেছে বাজারে ক্লাবঘর বসিয়ে। বিভিন্ন গ্রামের ছেলেপেলেদের ফুটবল কিনে দিয়েছে, ক্লাবঘর করার জন্যে টিন দিয়েছে। দরকার হলে সবাইকে দিয়ে আবার বিএনপি-র মিছিলও করাচ্ছে। এই কয়েকদিন আগেই যারা জাগদলের মিছিল করেছে এখন তারা সবাই বিএনপি করে। বাংলায় সংক্ষেপণ করলে দলটির নাম বেশ রসাত্মক হয়ে ওঠে। জমশেদ চাচা অন্ধ আওয়ামী লীগার। সংক্ষেপে বাজাদল বলতেই চাচা বেশি ভালবাসে। আমি জানি বিএনপি আওয়ামী লীগ কোনও ব্যাপার না, তোজাম্মেল ভাই ভেবে দেখেছে জমশেদ চাচাদের মতো লোকজন কবরে না যাওয়া পর্যন্ত লিডারশিপ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই তার আওয়ামী লীগে।

অতদিন ধৈর্য ধরার সময় নেই তোজাম্মেল ভাইয়ের। অতএব বিএনপি করা অনেক ভাল। সরকারি বা বিরোধী দল কোনও ব্যাপার নয়, আসল কথা পাওয়ার প্র্যাকটিস করা। এখন বয়স মাত্র তেত্রিশ হলেও সবাই তোজাম্মেল ভাইকে সালাম করে, দরবারে ডাকে, দু'এক কথা বলতে বলে স্কুলের স্পোর্টস-ফাংশান কিংবা মিলাদে। আবার থানা থেকে পুলিশ এলেও লোকজন তার খোঁজ করে। এসবের কারণ একটাই : কোনও বুড়ো হাবড়া আওয়ামী লীগের মায়া কাটিয়ে বিএনপি-তে যাওয়ার আগেই তোজাম্মেল ভাই মিছিল মিটিং কমিটি আর ঢাকার লিডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেতা বনে গেছে।

তবে একটা ব্যাপারে জমশেদ চাচা আর তোজাম্মেল ভাইয়ের কোনও তফাৎ নেই। আমার মনে হয়, কোনও চেয়ারম্যানেরই নেই। জমশেদ চাচার মতো তোজাম্মেল ভাইও সবসময় সঙ্গে একটা কালো ব্যাগ রাখে। সেই ব্যাগের মধ্যে থাকে ইউনিয়ন পরিষদের প্যাড, সিল সবকিছু। হঠাৎ করে একটানা ধানখেতের মধ্যে চলার সময় আলের ওপর হয়তো দেখা হয়ে গেল, আর দেখা হতেই মনে হল একটা চারিত্রিক সার্টিফিকেট দরকার, চেয়ারম্যান সাহেবকে বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আইলের ওপর বসে কোনও নাম ঠিকানা না লিখেই কয়েকটিতে সই আর সিলছাপ্পর মেরে দিলেন। মুখে বললেন,

নে। বাড়তি কয়েকটা রেখে দে। কখন কোন কাজে লাগবে আমাকে আবার খুঁজে পাবি না। আর নাম বাপের নাম ঠিকানা এসব নিজেই বসিয়ে নিস। আমি লিখে দিলে আবার মনে করবে যে চেয়ারম্যানের কোনও এ্যাসিস্টেন্ট নাই।

কতদিন এইভাবে চলছে, আরও কতদিন চলবে তা বলা মুশকিল। জমশেদ চাচা যেমন রাত বাহিনী কিংবা গণবাহিনী কাউকেই সার্টিফিকেট দিতে কার্পণ্য করত না, তোজাম্মেল ভাইও তেমনি বক্তৃতা দেয়ার সময় 'ওই আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনী..' ইত্যাদি বললেও কেউ চাইলে গদগদ হয়ে নির্বিচারে চারিত্রিক সনদপত্র বিলি করে।

জমশেদ চাচা আমার পিঠ চাপড়ে বলে,

ঠিক কাজ করেছিস। রাজাকারগুলো বেশি বেড়ে গেছে। আর কুত্তার বাচ্চা সর্বহারাগুলারে দেখ না, লেজ সোজা করে আর্মি আর পাকিস্তানী দালালগুলোর ল্যাওড়া চাটছে। ক্যান, আমাদের তো চান্স পেলেই গুলি করে মারিস, রাজাকার আর আর্মিদের সঙ্গে অত ভালবাসা কিসের? আর্মিদের ল্যাওড়াই যদি চুষবি তাহলে আইয়ুব ইয়াহিয়া কি দোষ করেছিল? পাছার মধ্যে রাজাকারগুলোর ল্যাওড়াই যদি নিবি তাহলে আমাদের আর ভারতের দালাল বলিস কেন?

চাচার কথা শুনতে শুনতে আমার কান গরম হয়ে ওঠে। আমি যে-কোনও উপায়ে তার হাত থেকে পালাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠি। কিন্তু জমশেদ চাচা নির্বিকার একেবারেই। আমি যে তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তার বলা কথাগুলো যে আমার কাছে শ্রুতিমধুর হতে পারে না তা চাচা তোয়াক্কাই করে না। বলতে বলতেই হঠাৎ চাচা আমাকে প্রশ্ন করে,

ওই বাজাদলের কুদ্দুসের সঙ্গে তোর এত খাতির কিসের রে?

একটু থেমে আবার বলে,

আর্মির লোকেরা তোর বাবাকে মেরে ফেলেছে, মনে নেই তোর?

মাথাটা আবারও কেন জানি বিগড়ে যায় আমার। যে ক্ষোভ সংগোপনে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করি তা আবারও বেরিয়ে পড়ে গলগলে রক্তস্রোতের তাগদ নিয়ে,

মনে আছে। এ-ও মনে আছে আপনাদের জন্যে বাবা মাসের পর মাস পালিয়ে বেরিয়েছে, নাগাল পেলে আপনারাও আর্মিদের মতো গুলি করে মারতেন। অথবা গলা কেটে ফেলে রাখতেন কিংবা লাশটাও গায়েব করে দিতেন।

জমশেদ চাচার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে, মুখটা সামান্য হা করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেননা চাচাও চিন্তা করে নি তার মুখের ওপর আমি এমন একটা কথা ঝাড়ব।

খেতে হয়, পড়তে হয়। সেজন্যে কি করব ভেবে আর কুল পাই না। প্রথমদিকে উদ্যম ছিল। বর্গাদারদের সঙ্গে নিজেও বীজ কিংবা চারা বোনার দিন, সার কিংবা নিড়ানি দেয়ার দিন খেতে চলে যেতাম। যেদিন ফসল কাটা হতো সেদিন সারাদিনই মাঠে পড়ে থাকতাম। আস্তে আস্তে বুঝলাম এসবই অর্থহীন। এতে বরং বর্গাদাররা বিব্রত হয়। তারা না পারে স্বাভাবিক হতে, না পারে চুপচাপ খেতের মালিকের উপস্থিতিতে কাজ করতে। আমি তাই শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র ফসল কাটার পরে ভাগ টান দেয়ার জন্যে খেতে যাওয়ার পথ বেছে নেই। মা মাঝে মাঝে অনুযোগ করে এভাবে না কি কাজ হয় না। নিয়মিত দেখাশুনা না করলে জানা যায় না কিছুই। অনেক সময় বর্গাদাররা এসে হয়তো এমনি এমনি বলে, চারা মরে যাচ্ছে সার দেয়া দরকার। তারপর সেই সার নিয়ে দেয় অন্য জমিতে। ফসল কাটার দিন প্রথম থেকেই খেতে না থাকলে না কি সুযোগ বুঝে ফসলের কয়েক বোঝা বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় বর্গাদারেরা।

আমি তাই পুরানো অভ্যাস ফিরিয়ে আনি। আবারও সকালে উঠি। আগে বাবা ডেকে তুলত, এখন আমি নিজেই উঠে মণীষাকে ডেকে তুলি। ভাল লাগলে মণীষাও বেরিয়ে পড়ে আমার সঙ্গে খেত দেখতে। চরাচরের মায়ায় চোখ বুলাতে বুলাতে আমরা ভাইবোন আলপথে হাঁটি। জমি দেখি, ফসল দেখি। মৃত্তিকার বুক চিরে মাথা তুলছে

সবুজ চারা আকাশের ডাকাডাকি শুনে। আমরা খেয়াল করি চারার গোড়ার মাটিতে যথেষ্ট পানি আছে কি না, পাতার দিকে তাকিয়ে সবুজের ঘনত্ব দেখে বোঝার চেষ্টা করি যথেষ্ট সূর্যের আলো পাচ্ছে কি না। কিংবা কোথাও বাসা বেধেছে কি না নাম না জানা পোকা।

এইসব করতে গিয়ে আমার যে কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে তা টেরই পাই নি। আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম আমি বাড়ির কাছের কলেজটাতে ভর্তি হব না। ভর্তি হব শহরের কলেজে। বাসে যেতে আসতে অবশ্য পাকা দু'ঘন্টা সময় বেরিয়ে যাবে, তবুও এই মরা কলেজে নাম লেখাব না। আমি তাই গো ধরে ভর্তি হই না। একটা বছর খুব কাছে থেকে জমিজমা দেখি, ফসল তোলা দেখি, মাতব্বরদের হাকাহাকি দেখি। জমি যে কি অসীম ক্ষমতার উৎস তা টের পেতে সময় লাগে না আমার। এখন কোনও দরবারে একজন বর্গাদারকে একটু কথা বলা শুনলেই আমি বাজি রাখতে পারি সে কার জমিতে বর্গাদারী করে কিংবা গাতা খাটে। বলে দিতে পারি কোন মাতব্বরের জন্যে কোন বর্গাদার লাঠি ধরবে। আমিও যে অনায়াসে এভাবে এদের ব্যবহার করতে পারি তা মনে হতেই ম্রিয়মান হয়ে পড়ি। ইচ্ছা করে সবকিছু বিলিবন্টন করে পথে পথে হেঁটে বেড়াই।

আমার মতো মণীষাও যে স্কুল বাদ দিয়ে বসে আছে তা আমার জানা ছিল না। পরপর কয়েকদিন দুপুর বেলা বাড়ি ফিরে ওকে দেখে একদিন বলি,

কি রে তোর শরীর খারাপ না কি?

না তো! কেন?

এই যে স্কুলে যাস নি।

মণীষার মুখ কেমন শক্ত হয়ে ওঠে। মাটিতে বাঘছাগল খেলার কোর্ট কাটতে কাটতে বলে,

ক্লাবের ধারের রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতে আমার ভাল লাগে না।

আমার শাঁ করে মনে পড়ে বাজারের মে'ন রাস্তাতেই ক্লাব ঘরটা বসিয়েছে তোজাম্মেল ভায়ের সাঙ্গোপাঙ্গোরা। স্কুলে যেতে হলে ছাত্রছাত্রীদের সেখান দিয়েই হেঁটে যেতে হয়। ক্লাবঘরের মধ্যে বসে তোজাম্মেল ভায়ের চেলাচামুণ্ডারা। তারা অবশ্য সেটাকে যুব কমপ্লেক্স বলে। ইউনিয়ন পরিষদের টিভিটা সেখানেই রাখা হয়েছে। রাতে সবাই ক্লাবঘরে ভিড় করে নাটক কিংবা অন্য কোনও ধারাবাহিক দেখতে। বেশির ভাগ সময়েই অবশ্য তাস খেলা হয়, কোনও কোনও সময় টাকা দিয়ে। কিংবা ক্যারাম খেলে। কখনও চেয়ারম্যান বলে থানা থেকে মাল মানে রিলিফ কিংবা কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের গম নিয়ে আসতে। তখন সব ফেলে ঠেলাগাড়ি নিয়ে রওনা হয় এরা।

রাত একটু বেশি হলে জুয়ার আসর বসে, সঙ্গে গাঁজা কখনও বাংলা মদ। কোনও কোনও দিন ডোজ বেশি পড়ে গেলে জুয়ারি যুবকেরা রাস্তায় দল বেধে বেরিয়ে পড়ে শ্লোগান দিতে থাকে, 'টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া/ সবাই বলে জিয়া জিয়া'। কিংবা যেদিন আগে থেকেই প্রোগ্রাম করে বেশি ডোজ খাওয়ার সেদিন কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের দুঃস্থ মেয়েদের বলা হয় রাতেও থেকে যেতে, 'রাতের খাওয়ার জন্যে মুরগি/ গরু পাক করতে'। আমাকে আর বলে দিতে হয় না স্কুলগামী মেয়েদের দেখে দিনের বেলাও 'জিয়া জিয়া' বলা শুরু করেছে জিয়ার সৈনিকেরা।

হাটবার ছিল সেদিন। বিকেলে বাজারে গিয়ে দেখি তোজাম্মেল ভাই ক্লাবঘর লাগোয়া সাকলায়েনের চায়ের দোকানে কুদ্দুসসহ আরো কার কার সঙ্গে চা খাচ্ছে আর গুলগপ্পো করছে। আমি যেয়ে তার চেয়ারের কাছে দাঁড়াই। আমাকে ওভাবে দাঁড়াতে দেখে কুদ্দুসের মুখ কেমন হয়ে আসে। তোজাম্মেল ভাই বত্রিশটা দাঁতই বের করে ফেলে আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্যে। আমি সে হাসিকে একটুও পাত্তা দেই না। একটুও না হেসে বলি,

তোজাম ভাই, এই ক্লাবঘরের কাছে দিয়ে যখন আমার বোন আর স্কুলের ছাত্রীরা স্কুলে যায় তখন আপনার চেলাচামুণ্ডারা নানান কথা বলে। আমি যদি যেখানে সেখানে আপনার বোন বৌ ভাইঝি ভাগ্নীদের দেখলেই বিছানায় নিয়ে শোয়ার কথা বলি আপনার কি তা খুব ভাল লাগবে।

তোজাম ভাই থতমত খেয়ে যায়,

কি- কি কচ্ছো তুমি?

আমি চোখ নামাই না। কেন জানি মনে হয় এখন চোখ নামালেই হেরে যাব আমি,

শোনেন নাই কি বলেছি? আবার বলতে হবে? শোনেন তোজাম ভাই খাল কাটার, রাস্তা মেরামতের গম চুরি করেন আর রাস্তা বাধার মেয়েদের যা খুশি করেন কিছুই দেখতে যাব না, বলবও না। কিন্তু স্কুলের ছাত্রীদের যদি কিছু বলেন তাহলে আপনার বাড়িতে যেয়ে বন্দোবস্ত করে আসব। মেয়ে তো আর নাই আপনার, বোন বৌ ভাতিজী ভাগ্নীদেরই বন্দোবস্ত করতে হবে।

তোজাম ভাই চেয়ার পেছনে ফেলে হুংকার দিয়ে ওঠে,

চুপ করে বসে আছিস ক্যান কুদ্দুস? বান শালারে-

আস্তে- আস্তে কথা বলেন তোজাম ভাই। আপনার পনের ষোলজন চেলাচামুণ্ডা আছে, আমারও পনের বিশ ঘর বর্গাদার আছে। হাত তুললে আপনার চেয়ে তিনগুণ বেশি লোক লাঠি নিয়ে বের হবে। আপনি আপনার চেলাদের চুরি করা গম আর দুঃস্থ

বিধবা মেয়েদের দিয়ে পোষেন, আমি বাপের হালাল পয়সা দিয়ে পুষি। পিঠা খাওয়ার আগে পিঠার ফোড় গুণে খাবেন।

তোজাম্মেল ভাই আমার জামার কলার ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়। আমিও একটু এগিয়ে যাই তার হাতটা ভালভাবে ধরবার জন্যে। কিন্তু কুদ্দুস আমাদের দু'জনের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। তোজাম্মেল ভাইকে সে ঠেলে সরিয়ে দেয় অন্য দিকে। আমাকেও সরিয়ে দেয় আরেকদিকে। তারপর আমার পিঠে হাত রেখে বাইরে নিয়ে আসতে আসতে বলতে থাকে,

আমাগে একটু আগে বলে নিবি না? পারিস তো খালি ঠ্যাং ভাঙতি। জোড়া লাগাতি যে কত ঠেলা তা তো আর চিন্তা করিস না।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে কুদ্দুসের দিকে সরোষে তাকাই,

শোন কুদ্দুস, আমার বাপের নাম তোর ভাল করেই জানা আছে। পারিস তো খালি পেছন থেকে লাথি মারতে। আমি পেছন থেকেও পারি, সামনে থেকেও পারি। সামনে থেকে দেখিয়ে গেলাম। সাবধান যদি না হস ক্লাবঘর তো ক্লাবঘর তোর ওই তোজাম ভাইয়ের বাড়িঘর পর্যন্ত ছাই হয়ে যাবে, ছাইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আমি প্রস্রাব করে আসব, আমার টিকিটাও ছুঁতে পারবি না।

কুদ্দুস আমার পিঠে হাত বুলানো থামায় না,

তোর কাছে হাত জোর করছি, তুই ইবার চুপ কর এগটু। আমি সব ম্যানেজ করছি।

আমি জানতাম সব ম্যানেজ হয়ে যাবে, যদিও কোনও না কোনও দিন আমাকে মাশুল গুণতে হবে। কিন্তু সেদিন কবে আসবে, এলে কি করব, কতটুকুই বা মাশুল দিতে হবে এসব নিয়ে চিন্তা করার একটুও সময় ছিল না। মাঠের পর মাঠ তখন পুড়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড রোদের তাপে, শরীর থেকে একটুও ঘাম ঝরে না, কেবলই পুড়তে থাকে চিড়বিড়িয়ে। ফসলের খেতগুলো সর্বনাশা তৃষ্ণা নিয়ে মুখিয়ে থাকে, একটু পানি পড়তেই শুষে নেয় সর্বগ্রাসী জিভ বাড়িয়ে। তারপর তাতেও কাজ না হওয়াতে একসময় মিইয়ে আসে, ফসলের ভারে নয় রোদের ভারে সে নুইয়ে পড়ে মাটির ওপর। তার ওপরে আবারও নেমে আসে বালিভাজা রোদ, শুকাতে থাকে সবটুকু প্রখরতা ঢেলে। আমাদের বলা হয় ফারাক্কার জন্যে না কি এই সর্বনাশা ঘটনা ঘটছে। নদীতে পানি নেই, পানি নেই জলাশয়ে। পানি শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষও শুকিয়ে মরা পাটশলা হয়ে যাচ্ছে রংপুরে, কুড়িগ্রামে, লালমনিরহাটে, দিনাজপুরে, বগুড়াতে। আমের মুকুল ঝরে পড়েছে, এখন মানুষও ঝরে পড়তে শুরু করেছে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের দিকে।

বর্গাদাররা একেকজন আসে আর বিলাপ করে। এবার ভাগ্যগুণে যদিবা কোথাও ধান টিকে যায় তার শীষেও থাকবে না চিটা ছাড়া অন্য কিছু। শূন্য মাঠগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, মৃত্তিকার অন্তরীক্ষে জমা হচ্ছে দিনভর আকাশের তাপ। স্কুলের মাঠে আমার সামনেই আগুন লেগে গেল ঘাসে। ভোর হতেই দেখি গ্রামের মেয়েরা দল বেধে বেরিয়েছে পানির খোঁজে নদীর দিকে। নদীও শত্রুতা শুরু করেছে, কিংবা প্রতিশোধ নিচ্ছে, প্রতিদিনই সে নিজেকে শুকিয়ে ফেলতে ব্যস্ত ঘাটের নৌকাটাকে বেকার করার পরে নগ্ন তলানী দেখাবে বলে। প্রথমে শুকিয়েছে ডোবা নালা, তারপর চোখের সামনে পুকুরের কর্দমাক্ত তলদেশও কাঠ হয়ে গেল, দেখতে দেখতে হাতনলকূপের পানির সঙ্গে বালি ওঠা শুরু করল, একদিন বালিওয়ালা পানি ওঠাও বন্ধ হয়ে গেল। দূরের গাঁয়ে নলকূপে পানি থাকার উড়ো খবর আর নদীর চই চই ডাক শুনতে শুনতে গ্রামের মেয়েরা প্রতিদিনই বেরিয়ে পড়ে তাদের পেছন পেছন। মণীষাও বেরিয়ে পড়ে তাদের সঙ্গে কাঁখে হাড়ি নিয়ে।

পানি মিললেও তা নিয়ে মা আর মণীষার প্রতিদিনই ঝগড়া লাগে। মণীষা চায় খাওয়ার পানি ফুটিয়ে নিতে। কিন্তু পানি এমনিতেই আগুন হয়ে আছে, ফুটিয়ে নিলে তা হয়ে যায় হাবিয়া দোযখ। আর কোথাও একটু বাতাসও নেই যে ঠাণ্ডা করা যাবে। মা তাই চায় ওই অবস্থাতেই পানি খেতে, মণীষার জোর আপত্তি তাতে কলেরা হওয়ার আশংকাতে। ঘরের মধ্যে আমরা টিনের চালের গরমে সিদ্ধ হওয়ার ভয়ে বসে থাকি আম কিংবা কাঠাল গাছের নিচে। চেয়ে চেয়ে দেখি গাছের পাতা সালোক সংশ্লেষণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, প্রতিটি পাতাই ধীরে ধীরে লজ্জাবতী গাছের পাতা হয়ে পড়ছে। কৃষকেরা মাথাল মাথায় দিয়েও কাজ করতে হিমশিম খাচ্ছে, তাদের রোদে পোড়া কালো চামড়া পুড়তে পুড়তে লাল হয়ে উঠছে। আমি প্রমাদ গণি, ঘরের চাল প্রায় শেষ হওয়ার পথে, আম গাছে এবার আর কোনও আম নেই, অনেক আগেই রোদের দিনে একটু স্বস্তি পেতে লোকজন কাঁচা আমই সাবাড় করে ফেলেছে, কখনও খালি মুখে, কখনও খাট্টা বানিয়ে, কখনও-বা ডালের মধ্যে ছেড়ে খেতে ভাল লাগে বলে। কোথায় কোন কারাগারে কাদের গুলি করে মারা হলো তা আর কারও মনে দাগ কাটে না, উলশি-যদুনাথপুরে নাকি এখনও পানি আছে এই আলাপেই সবাই নিমগ্ন হয়ে পড়ে। গ্রামের কয়েকজন কয়েকটা ভ্যান ভাড়া করে তাতে বড় বড় কয়েকটা ট্যাংকি নিয়ে একদিন সাতসকালে রওনা হয় উলশি-যদুনাথপুরের দিকে। তারপর ফিরে আসে ব্যর্থ হয়ে দুঃখী-দুঃখী মুখে।

কিন্তু আমাদের জন্যে আরও দুঃখ অপেক্ষা করছিল। পরদিন দুপুরে হঠাৎ দূরে আমরা ধোঁয়া দেখি। ধোঁয়া ক্রমশঃ মুখ উঁচু করে আকাশ পানে, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেলিহান আগুনের বুভুক্ষ শিখা। সে শিখা ক্রমশঃ বিস্তারিত হতে থাকে, মানুষের হায়

হায় আহাজারি শুনে আমিও বেরিয়ে পড়ি আগুনের উৎসের দিকে। কিন্তু আমরা হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হয়েও কিছু করতে পারি না। সরব দর্শক হয়ে আমরা শুধু দেখি কিভাবে আগুন ঘরদোর গিলে নিচ্ছে। কেউ বুক চাপড়ে কাঁদে, কেউ ফিট হয়ে পড়ে, কেউ পাগলের মতো নিজেও ঝাঁপ দিতে চায় সেই মায়াবী অগ্নিশিখার ভেতর। এ যাত্রায় কেবল আমাদের বাড়িই রক্ষা পায়, মূল গ্রাম থেকে দূরে মাঠের মধ্যে হওয়ার কারণে।

আমি দেখি; আবারও সেই পুরানো দৃশ্যই দেখতে হয় আমাকে,- দলে দলে মানুষ খালি হাত পায়ে রওনা হচ্ছে শহরের দিকে, কিংবা অন্য কোনও গাঁয়ে ঘনিষ্ট আত্মীয়ের বাড়ির দিকে, তাদের মুখ ভাবলেশহীন, দৃষ্টিতে অথৈ শূন্যতা, পা আড়ষ্ট ও ক্লান্ত হলেও পথের নেশায় টালমাটাল, তারা বেরিয়ে পড়ছে যেমন বেবিলন থেকে সুদূর অতীতকালে মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে।

আমিও বেরিয়ে পড়ি। তবে কলেজে যেতে। এবার আর ভুল করি নি। ভর্তি হয়েছি ঠিক সময়েই। ক্লাসে যাই বাসে করে। বেশ খানিকটা পায়ে হেঁটে গিয়ে রোডে উঠে বাসে চড়ে যেতে হয় কলেজে। মাকে বলি, চিন্তা কর না তোমরা। আমি তো আর একেবারে চলে যাচ্ছি না। প্রতিদিনই ফিরে আসব। বললেও শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে না। কলেজের জীবন আমাকে প্রলুব্ধ না করলেও স্বাভাবিকভাবেই আমি তাতে জড়িয়ে পড়তে থাকি। গল্পে গল্পে বেলা ফুরায়, কলেজের পাশে জামালের দোকানের চা ডালপুরি সিঙ্গারা ঠাণ্ডা হয় না তবু। ক্লাস শেষ হতেই রুম বদল করে সিট দখলের জন্যে দুমদাম দৌড় দেয়ার আনন্দ আমাদের বিবশ করে রাখে। কে যেন ব্লাকবোর্ডে কেমন সুন্দর হাসির ছড়া লিখে রেখেছে কেমেস্ট্রির রগচটা গোলগাল মুসা স্যারকে নিয়ে। কে আবার হাসল পরিসংখ্যানের হেকমত স্যারের ছেঁড়া গেঞ্জি ঘামে ভেজা শাদা জামার নিচে স্পষ্ট দেখা যাওয়াতে। ছাত্র ইউনিয়নের শুভ্রা মেয়েটা কী সুন্দর দেখতে আর যখন কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বার্নারের কাছে দাঁড়িয়ে আগুনের তাপে ঘেমে ওঠে তখন মুখটা আরও কত সুন্দর হয়ে ওঠে! আবার কেমন সুন্দর গানও গাইল নবীন

বরণে 'এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে জীবনে যোগ নতুন কিছু দিলাম'..। কলেজের খোলা মাঠে মিছিল বের হলে তার ধ্বনি কেমন ইথারে ইথারে ছড়িয়ে পড়ে। ওইখানে পুকুর পারে কী ভীষণ নির্জনতা, মেয়েগুলো বসে সময় পেলেই আড্ডা দেয়, কেউ কিছু বলে না। চুল ওড়া দেখব বলে শুভ্রার পেছনের সিটে একদিন বসে পড়ি আমি মামুনের প্ররোচনাতে। তখন হঠাৎ চোখ পড়ে যায় শুভ্রা তার খাতার ওপরে লিখে রেখেছে, 'যে শুনেছে কানে তাহার আহ্বান গীত...।' আমি রাজনীতি করি না মনে পড়ায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ি। আচ্ছা আমি কি ছাত্র ইউনিয়ন করব? ভাবতেই হাসি পায়। কিন্তু তারপরেই হাসি মিলিয়ে যায়। প্র্যাকটিক্যালের কাজে ব্যবহৃত একটি মরা ব্যাঙ কে যেন ছুড়ে মেরেছে শুভ্রার মাথাজোড়া চুলের অমাবস্যায়। আর স্যারও কি না আমাকেই সন্দেহ করে বসলেন। লজ্জায় আমি মাথা তুলতে পারি না। স্যার আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখেন। আমি, যে আমি তোজাম্মেলকে হাটভর্তি মানুষজনের সামনে হুমকি দিয়েছিলাম সে কিছুই বলতে পারি না, দাঁড়িয়ে থাকি অধোবদনে। মামুন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়,

স্যার, তথাগত নয়, আসলে ব্যাঙটা আমি ছুঁড়েছিলাম।

স্যার থতমত খেয়ে যান। শুভ্রা আমাদের দু'জনকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কেমন রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠার আগেই স্যারকে বলে,

স্যার আমার মনে হয় ওদের দু'জনের কেউই ছোঁড়ে নি ওটা। দূর থেকে কেউ ছুঁড়েছে।

হবে, তাই হবে হয়তো। – স্যার হাফ ছেড়ে বাঁচেন। আমি আর মামুন দু'জনেই বসে পড়ি। কিন্তু চোখ নুইয়ে পড়ে ক্লাসঘরের মেঝের ওপর, মুখ আর তুলতে পারি না। শেষ পর্যন্ত এ-ও কপালে ছিল আমার! এই নারী কেলেংকারী! কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিয়ে চলি আমি। মামুন আমাকে সান্ত্বনা দেয়। তারপর গিটার বাজাতে শুরু করে। প্রথম যখন মামুনের আমার পরিচয় হয় তখন তাকে আমি একদম সহ্য করতে পারতাম না এই গিটারের জন্যে। একদিন বনিএমের কি একটা গানের সুর ভাজার সময় আমি তার ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। মামুন মিটমিট করে হাসতে থাকে, বলে আমাকে একটা ভাল গান শোনাবে। বলে সে সুর ভাজতে থাকে ফাইভ থাউজ্যান্ডস মাইল্‌স্-এর। আর ওই মুহূর্তে মামুন আমার প্রিয় বন্ধু হয়ে যায়। আমি গিটারে আবারও গানটা শুনতে থাকি আর ক্লাসের ঘটনা ভোলার জন্যে কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করি, রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও অন্তত একটা ভুল করেছেন লেখার খাতায়, এই গাছের ফুল বসন্তকালে ফোটে ভেবে গান লিখে গেছেন তিনি। মামুন আমাকে বলে হোস্টেলে সিট নিতে। কিন্তু আমি রাজি হই

না। মনে হয় মা আর মণীষা দুঃখ পাবে। কিন্তু হোস্টেলে সিট নিলে মাঝে মাঝে থাকা যাবে, আড্ডা দেয়ার একটা বৈধ জায়গা হবে, এ দিকটাও আমাকে টানতে থাকে। মামুন স্মরণ করিয়ে দেয় তার বাড়ি শহরে জন্যে সে কোনওদিনই সিট পাবে না। তবে আমি সিটের জন্যে আবেদন করলে সে তা পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারে, টাকাটাও সে-ই দিতে পারে। আমরা শুধু মাঝেমধ্যে থাকব, একসঙ্গে আড্ডা দেব, এই আর কি।

স্টুডেন্ট ইউনিয়নের নির্বাচনের আগে-আগে হোস্টেলে সিট বরাদ্দ হল আমার। ইলেকশন সামনে বলেই হয়তো এতদিন যে ছাত্রনেতা ওটা বেদখল করে রেখেছিল সে আর আপত্তি না করে সুড়সুড় করে ছেড়ে দিল। তিন সিটের রুমটাতে একজন সিনিয়র। যেদিন আমি হোস্টেলে রাত কাটাব বলে ঠিক করলাম সেদিনই এমন ঘটনা ঘটল যে সিনিয়র জুনিয়রের তফাৎ ঘুচে গেল। তার আগেই সিটে বিছানা পাতা হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন টিফিন পিরিয়ডে রুমে এসে শুয়ে বসে গল্প করতাম আমি আর মামুন। খাওয়াদাওয়া করতাম হোস্টেলের ক্যান্টিনে। প্রায় প্রতিদিনই সেখানে বিখ্যাত ও-খেকো ঘাইরা মাছ রান্না করা হয়। ইলেকশনের দিন আড্ডার চাপ বেশি পড়ায় ঠিক করলাম আজ আর বাড়ি ফিরব না। সন্ধ্যার একটু পরে জানা গেল, ছাত্রদল পুরো প্যানেলে জিতে গেছে ইলেকশনে। নতুন ভিপি জিএস এসে হোস্টেলে ঘোষণা করে গেল, আজ রাতে গরু জবাই করা হবে, খিচুড়ি পাকানো হবে, আরও থাকবে ড্রাম ভর্তি বাংলা মদ, যার যতটুকু খুশি খেতে পারবে, এমনকি কেউ যদি ইচ্ছা করে তবে ব্লু ফিল্ম দেখার ব্যবস্থাও করতে পারে। তবে 'ওনলি ফর টুডে নাইটস্'।

আমাদের নতুন ভিপি'র এই ঘোষণা শুনে হোস্টেলের বারান্দার সামনে সমবেত ছাত্রের দল উল্লাসে ফেটে পড়ে। একজন হেঁড়ে গলায় শ্লোগান দিতে থাকে 'স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া, লও লও লও সালাম'। কোদাল হাতে গেঞ্জি পরা একজন চশমাওয়ালা মানুষের ছবি এ্যামবুশ করা গেঞ্জি গায়ে কয়েক ছাত্র লাফাতে থাকে শ্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে। মামুন আমার কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে পুকুর ধারে নিয়ে আসে। আমার হোস্টেল জীবন কেমন হবে তার কিছুটা নমুনা পেয়ে কেমন যেন বমি-বমি লাগে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেই। হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বেচারা কোথায় পালাল কে জানে। বিজয়ের এই তোড়ে আমি যদি আবার সিট হারিয়ে ফেলি তাহলে খুবই মুশকিল। যে ছাত্রনেতা আমাকে সিট ছেড়ে দিয়েছিল সে তো বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছে আমি যাতে ইলেকশনের মিছিলে যাই অন্ততপক্ষে প্যানেল পরিচিতির দিনে। কিন্তু আমি তার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছি। ইলেকশনের এই ডামাডোলে আমার আর মামুনের কাজ ছিল প্রতিদিন কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে আড্ডা দেয়া আর ছাত্র ইউনিয়নের মিছিল বের হলে শুভ্রা কেমন করে শ্লোগান দেয়, কিংবা ভোটের গানে

লিড দেয় তাই দেখে যাওয়া। ভোটও আমরা দিয়েছি ইচ্ছামতো। ভিপি কিংবা জিএস পদে আমরা ভোটই দেই নি কাউকে পছন্দ হয় নি বলে।

কোথায় যেন আবারও হল্লোড় শোনা যায়। জোরে মাইকে বাজে 'ডিসকো বিবি মোটি'। আমরা হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে নদীর পারে। এবার সিগারেট টানতে টানতে কথা বলা যায় কিংবা গান শোনা যায়। কিন্তু মামুন গাঁজা ধরায়। আমি অবাক হবার আগেই বলে, যে গানটা এখন গাইবে সেটার সঙ্গে না কি এটা না হলে কিছুতেই জমে না। মামুন যে গাঁজা টানার বিদ্যাটা বেশ ভাল করেই রপ্ত করেছে তা আমার একদমই জানা ছিল না। কিন্তু আমার মন একেবারেই বখে গেছে তখন। যে দেশে ছাত্র রাজনীতি করা ছেলেরা ভোটে জিতে ব্লু ফিল্ম দেখে রাত কাটাতে চায় সে দেশের একজন সাধারণ ছেলে তো গাঁজা-ভাং খেতেই পারে। অপরাধবোধ ঝেড়ে ফেলে আমি গাঁজা টানতে টানতে নদীর ধারের বালির ওপর সটান শুয়ে পড়ি। আকাশ আজ ঘোলাটে কেমন। কিন্তু তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। বোধহয় ওটা কালপুরুষ। ও মামুন, তুমি তারা দেখা জান? মামুন আমার কথা শোনে না। সে একমনে গান গায় আর গিটার বাজায়,

ইমাজিন দেয়ার'স্ নো হেভেন/ ইট'স্ ইজি ইফ য়ু ট্রাই/ নো হেল বিলো আস/ এ্যাবোভ আস ওনলি স্কাই/ ইমাজিন অল দ্য পিপল/ লিভিং ফর টু ডে/ ...ইউ মে সে আই'ম আ ড্রিমার/ বাট আই'ম নট দ্য ওনলি ওয়ান/ আই হোপ সাম ডে য়ু'ল জয়েন আস..

শুনতে শুনতে আমার মনে হয় আকাশ যেন আমার সামনে তার দরজা কবাট হা করে খুলে দিয়েছে। আর আমি ডানা মেলে উড়ে চলেছি চারপাশের নীল ফেনার মধ্যে দিয়ে। কোথায় যেন শীতল বাতাস। তার আবেশ এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার শরীর। একটা পাখি এসে আমাকে বলল, আমি তোমার সঙ্গে পাল্লা দেব। কিন্তু সে হেরে গেল। তারপর একটা গাছের ডালে বসে হাফাতে শুরু করল। আমি বললাম, হাঁটব আমি। আকাশের মেঘরা এসে আমাকে পায়ে চলার পথ তৈরি করে দিল। আমি মেঘে মেঘে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ লাফ দিয়ে মামুনের কাঁধ ধরে বলে উঠলাম,

শোন মামুন আরেকটা গান আছে, গাঁজা টেনে শুনলে হেভি মজা লাগবে।

গিটার থামিয়ে মামুন বলল,

কোন গানটা।

ওই যে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত। – আমি গাইতে শুরু করি – আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে ওই বাজে, তোমারি নাম সকল তারার মাঝে, ওই বাজে..

মামুন শোনে আর মাথা নাড়তে থাকে। সারা রাত আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি কোথায় যেন জলধারার কলরোল শোনা যাচ্ছে। ভাল করে খেয়াল করতেই দেখি পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে ঝরনাধারা, আর মণীষা অবগাহন করছে সেই ঝরনাধারায়। কখনও দেখি শুভ্রা মেঘ হয়ে গেছে, মেঘ হয়ে আমার চারপাশে ঘুরঘুর করছে। তারপর মামুন গিটারে 'সানশাইন অন মাই শোল্ডার মেকস্ মি হ্যাপি' গান ধরতেই মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে আমাকে ভিজিয়ে দিল।

নদীপার থেকে আমরা হোস্টেলে ফিরে এলাম খুব সকালে। তখনও কারও ঘুম ভাঙে নি সারা রাতের আনন্দউল্লাসের ভারে। কেবল জামাল ভাই তার দোকান খুলে ঝাড়ু দিয়ে চুলা জ্বালিয়েছে। হান্নান ময়দা মাখছে বারকোশে করে। সেই ময়দা মাখা শেষ হলে প্রথম যে পরোটাগুলো ভাজা হলো তা ভাগাভাগি করে খেলাম আমি আর মামুন। চা খাওয়া শেষ করে খুব আয়েশী ভঙ্গীতে সিগারেট ধরানোর পরে শুনলাম জামাল ভায়ের এক ব্যান্ডের রেডিওতে দুঃখী-দুঃখী গলায় কে যেন খবর পড়ছে। তার দুঃখিত হওয়ার কারণও আছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গতকাল রাতে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে মারা গেছে। আমার একটুও কষ্ট হল না। মনে হলো সত্যিই কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমার সারা শরীরের আগুন নিভে গেছে। তলপেটের কাছে বাবার পিস্তলের শীতল পরশ ছড়িয়ে পড়েছে আমার সারা শরীরে।

মামুন মারা গেল এর আট কি ন' মাস বাদে। ততদিনে আমি হোস্টেলে জাঁকিয়ে বসেছি। মাঝে মাঝে টিভি র মে গিয়ে সুবর্ণা মোস্তফার লাস্য মাখানো দেখি। বেশিক্ষণ বসে থাকতে ভাল লাগে না। বাড়িতে যাই, তাও বোধহয় মণীষা আছে বলে। মা'র সঙ্গে আমার তেমন কোনও স্মৃতি নেই, তাই তার জন্যে কষ্টও হয় না তেমন। এর মধ্যে মণীষাও কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে। প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে থানার কলেজটাতে ক্লাস করে সে। দেখা হলেই মা মণীষার জন্যে পাত্র দেখতে বলে। কিন্তু ষোল-সতের বছরের একটা মেয়ে সংসার করছে ভাবতেই কেমন যেন লাগে আমার। পাত্র দেখার কাজ এগোয় না তাই। একেক সপ্তাহে একেক বই লাইব্রেরি থেকে তুলে আনে মণীষা আর চোখ কান নাক বুজে ছুটির দিনের পুরোটাই সে বই পড়ে কাটায়। শনিবারে বই তোলে, লাইব্রেরিতে পুরানো হলেও ওর কাছে তো আনকোরা। রবিবারে তাই কোনও পাত্তা পাওয়া যায় না ওর কাছে। সোমবার সকালে যখন শহরের বাস ধরার জন্যে বের হই তখন ওকে কেমন অপরাধী-অপরাধী মনে হয় গল্পগুজব না করে ছুটির পুরো দিনটাই বই পড়ে কাটাল বলে। আমিও তখন ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করি। মায়ের কাছে বসে মনোযোগ দিয়ে হালআবাদের অবস্থা আর বর্গাদারদের মতিগতি। দরকার হলে দেখা করি কোনও বর্গাদারের সঙ্গে। অথবা চা খেতে খেতে আড্ডা দেই সাকলায়েনের

চায়ের দোকানে বসে। তোজাম্মেল ভাই যে পাকা পলিটিশিয়ান তাও বুঝতে পারি। দেখা হলেই কথা বলে, যেন কোনও ঝগড়াঝাটি হয় নি আমাদের মধ্যে।

শীতপেরুনো এক সকালে আবারও দেশে সামরিক শাসন এল। আমাদের শহর আবারও ব্যস্ত হয়ে পড়ল সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই সমস্ত কাজ গুটিয়ে নিতে। রাত ন'টার পরে আর কোনও বাড়িতে বাতি জ্বলে না। সবাই ভয়ে ভয়ে থাকে কখন না কখন হানা দেয় জলপাই বাহিনীর লোকেরা। সবাই যার যার বাড়ির দেয়ালে চুনকাম করে আবার, মুছে ফেলে দেয়াল লিখন। ফুটপাতগুলো এখন একেবারেই ফাঁকা, হকাররা আর বসে না দোকান নিয়ে। কোনও জনসভার মাইকিং শোনা যায় না, কেবল শুক্রবারের দিন সিনেমা হলের লোকজনেরা ধুমধাম করে মাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সারা শহরে। দেয়ালে চুনকাম ঠিকমতো না করাতে এক বিকেলে জলপাই বাহিনীর লোকেরা ট্রাফিক স্ট্যান্ডে সাহেবালী ডাক্তারকে আধঘন্টা দাড় করিয়ে রাখে। চালকলের শ্রমিক রহমতের চুল একটু বড় মনে হয়েছিল ওদের কাছে। তাই ওরা কাচি দিয়ে চুল কেটে নেয় মাথার মধ্যে থেকে। এক ভদ্রমহিলা ইন্ডিয়ান শাড়ি পরে বেরিয়েছিলেন। জলপাই বাহিনীর লোকেরা চোরাচালান করা শাড়ি পরেছে বলে তাকে পাকড়াও করে রাস্তার মধ্যে। মহিলা 'আপনারা অসৎ বলেই তো এসব জিনিস বর্ডার ক্রস করে আসে। সস্তা জিনিস পেলে আমরা পরব না কেন?' বলায় আরও ক্ষেপে যায় তারা। তারপর নেহাত মহিলা বলে কোমরের ওপরে পাঁজর বরাবর আলকাতরার পোজ মেরে দেয়। রাত দু'টার পরে মানস সেলুনের কর্মচারীর হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ পায় এবং সে বেরিয়ে রাস্তার ম্যানহোলের গর্তেই বসে পড়ায় জলপাই বাহিনীর গাড়ি তুলে নিয়ে যায় তাকে। শুধু মারধোরে বিষয়টার নিষ্পত্তি ঘটে না, নিজের প্রস্রাব নিজে পান করে জলপাই বাহিনীর খপ্পর থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে। কয়েকদিনের জন্যে শহরটায় চাঁদাবাজ আর মাস্তানদের খবরদারি একটু কমে আসে। কাছিমের মতো গলাটাকে খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে তারা অপেক্ষা করে আর কয়েকদিন পরে জলপাইরঙাদের সঙ্গে ভাগেজোগে চাঁদাবাজি আর মাস্তানি করবে জন্যে।

ওর মধ্যেই স্যাররা ঠিক করলেন, কলেজে বিদায় অনুষ্ঠান হবে। ছাত্র সংগঠনগুলো একটু নড়েচড়ে বসল। কোনও কাজ নেই, এইসব টুকিটাকি প্রোগ্রাম করে যদি সংগঠনের ছেলেপেলেদের চাঙ্গা রাখা যায়! ছাত্রলীগ, ছাত্রদল সবাই সুবোধ বালকদের মতো বসল অনুষ্ঠান চক আউট করবার জন্যে। আমি, মামুন, আইয়ুব, হারুন, কাশেম, শফিক এরা কোনও সাতেপাঁচে না থাকলেও ছাত্র সংসদ রুমের কাছে ঘুরঘুর শুরু করলাম। আমাদের উদ্দেশ্য খুবই নিরীহ,- শুভ্রার গানের রিহার্সেল দেখা ও শোনা। কিন্তু আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল, যে শুভ্রা নবীন বরণে *এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে* গেয়েছিল তার এ কি অধঃপতন! সে কি না গাইছে *কতদূর আর কতদূর, প্রেমেরও সেই মধুপুর!* শুনতে যে খারাপ লাগে তা কিন্তু নয়, বরং খুবই

ভাল লাগে, কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন খচ খচ করে, কেবলই মনে হয় এখন জলপাই বাহিনী ঘুরঘুর করছে আর বাবাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছিল এরা। তাছাড়া শুভ্রা তো ছাত্র ইউনিয়ন করে।

মামুনকে আমি তৃতীয় দিনে বলি এই কথা। মামুনও মাথা নাড়ে। বলে,

এইসব গানই যদি গাইবে তবে আমি শালার দোষ করলাম কোথায়? আমিও গান গাব।

কিন্তু মামুন ওরকম গান গায় না। যদিও আমাদের ধারণা ছিল সেরকম গানই গাওয়া হবে, প্রোগ্রাম বেশ জমে উঠবে। দর্শকের সারিতে বসে আছে ডিসি, তার পাশে ক্যান্টনমেন্টের কয়েকজন নামকরা অফিসার। যেসব ছাত্রনেতাদের তখনও ধরার প্রয়োজন বোধ করে নি পুলিশ কিংবা খুব বেশি ঝামেলা না হলে ধরবেও না তারাও আছে। কিন্তু সবাই বসে আছে ইঁদুর হয়ে। ঢাকা ভার্সিটিতে না কি ছাত্ররা মিছিল মিটিং শুরু করে দিয়েছে, এখানে সে সম্ভাবনা দূরঅস্ত। নাকি নাকি গলায় যেভাবে আমাদের ভিপি জিএস বক্তৃতা দিল তাতে তো বরং মনে হল এরশাদ পার্টি তৈরি করলে এরাই আগেভাগে দৌড় দেবে। পরিস্থিতি এইরকম। ওরই মধ্যে মামুন স্টেজে উঠল গিটার নিয়ে, ছাত্ররা হৈ হৈ করে উঠল মামুন হয়তো *বাই দ্য রিভার বাবিলন* কিংবা এই ক'দিন আগেই বাজার মাত করা *মন শুধু মন ছুঁয়েছে* গাইবে ভেবে। কিন্তু মামুন সেসবের ধারে কাছে গেল না। সে কয়েকবার কর্ড স্পর্শ করে ঝংকার তুলে দেখল আওয়াজ ঠিকমতো আসছে কি না। তারপর বলে উঠল,

আমি সলিলের গান গাইব। বলেই গান ধরল,

উদয়পথের যাত্রী ওরে রে ছাত্রছাত্রী মশাল জ্বালো মশাল জ্বালো মশাল জ্বালো...

মানুষ যখন কোনও গানের অনুষ্ঠানে উচ্ছাসে ফেটে পড়ে তখনই আমার এই অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ে। কেউ কোনও কথা বলছে না, শুধু জলপাই বাহিনীর অফিসারগুলোর চোখ কেমন হিংস্র হয়ে উঠছে আর স্যারদের চোখে আকাশ অন্ধকার করা উদ্বেগ জমা হচ্ছে, ছাত্রনেতারা চোখমুখ নিচু করে আছে আর তাদের সমস্ত লজ্জা দীনতা হীনতা ভীরুতাকে মুছে দিচ্ছে মামুন তার গানের একেকটি লাইন দিয়ে। শুভ্রা তার কী সুন্দর গ্রীবা বাকিয়ে তাকিয়ে আছে মামুনের মুখের দিকে আর ঠোঁট মেলাচ্ছে মনে মনে, কিন্তু আমার একটুও হিংসা হচ্ছে না। আমার ভীষণ গর্ব হচ্ছে আমার এই বন্ধুর জন্যে, কেননা তার সঙ্গে আমার নিবিড় সখ্যতার কথা এ কলেজের কে না জানে! মামুন অকস্মাৎ হ্যামিলনের বংশীবাদক হয়ে ওঠে, আমরা সবাই তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠি, *মশাল জ্বালো...*

জলপাই বাহিনীর এক অফিসার উঠে দাঁড়ায়, বেরিয়ে যায় গটগটিয়ে পাশের জনকে 'এ্যারেস্ট হিম' বলে। এবং তখনই মামুনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায়।

মামুন, তোমার কি খুব কষ্ট হয়েছিল, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি নিজের অজান্তেই বলে উঠি, যেন আমি শুয়ে আছি সেই নদীর তীরে। তুমি তো বলতে সহ্যের অতীত কোনও কষ্টই নেই মানুষের। যখন কষ্ট সহ্যের অতীত হয় তখন তার শরীর স্তব্ধ হয়ে পড়ে, কিংবা সে মানুষ আত্মহত্যা করে। তুমি কি জানতে না ও গান গাওয়ার পরে কি অবস্থা হতে পারে? অথবা আমিই ভুলে যাই গ্রীক উপাখ্যানের হেক্টরের গল্প তোমার সবচেয়ে প্রিয়। অসুস্থ হলে, খেতে মন না চাইলে তোমার মা তোমার মন ভোলাত এই উপকথা শুনিয়ে। দেবতাদের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ। মানুষ পারবে কেন, সে তো মরণশীল। আর দেবতারা অমৃতের গুণে চিরজীবী। সবাই দৌড়াচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে, শুধু হেক্টর একা দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রী তাকে পিছু ডাকছে সন্তানের দোহাই দিয়ে, বাবা তাকে ডাকছে পিতৃত্বের অধিকারে। অবশেষে মা যখন ডাক দিলেন, দোহাই দিলেন স্তন্যধারার যে সুধাধারা বড় করে তুলেছে তাকে, তখন হেক্টর পিছু ফিরে শুধু বললেন, মা আমি তো জানি মানুষকে মরতেই হয়, দেবতারা কেউই মরবে না, কিন্তু ভীরুর মতো পিছু ফিরে মরে মনুষ্যত্বের অপমান কেন করব বল? আমরা আমাদের সমস্ত ভীরুতা আর দীনতা নিয়ে মরে মরে বেঁচে থাকি জলপাইরঙা দেবতাদের সঙ্গীনের আস্ফালনে। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বাবারা পাত্র খুঁজতে শুরু করে তাদের ভেতর, শুভানুধ্যায়ী বড় ভাই কিংবা আত্মীয়স্বজনেরা ইন্টারমিডিয়েট পাশ করা ছেলেদের পরামর্শ দিতে থাকে ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে সেনাবাহিনীর কমিশনড্ র‍্যাঙ্কে চাকরির জন্যে পরীক্ষা দিতে, আর স্বপ্নবিলাসী সুবিধাবাদী ছেলেরাও ব্যায়াম আর ছোলাবুট খাওয়া শুরু করে বুকের ছাতি বাড়াবে বলে। শুধু মামুন একা একা চলে যায় অনেক দূরে। তিনদিনের ইন্টারোগেশন শেষে ছাড়া পায় সে সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে। মামুনের দেহ পড়ে থাকে হাসপাতালের ঠাণ্ডা মেঝের ওপর যতক্ষণ না ওর মা গিয়ে ওকে কোলে তুলে নেয়। আর নপুংসক ডাক্তারেরা পাশ কাটিয়ে চলে যায়, সিট নেই বলে জানায় মামুনকে জলপাই বাহিনী হাসপাতালে রেখে গেছে শুনে। মামুনের লাশ খাটিয়াতে, আমার কী যে ইচ্ছা করে একটা কোনা কাঁধে তুলে কবরস্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে, কিন্তু আমি তো কোনও দোয়া জানি না, কেমন করে জানাজা পড়তে হয় তাও জানি না, আমি শুধু শবযাত্রীদের সঙ্গে মুখ নিচু করে হেঁটে চলি, যেন এ লাশ আমার চেনাজানা কার নয়, মনে হয় খাটিয়াতে বসে বসে মামুন গিটার বাজায়, *ইফ ইউ মিস দ্য ট্রেন/ এ্যান্ড আই এ্যাম অন গো/ ইউ ক্যান হিয়ার দ্য হুইশল্ হ্রো হানড্রেড মাইলস্*। কোন ট্রেন? কোথায় যাবে? কেউই বলে না কিছু। মামুনও না। ক্রমাগত সে দূরে চলে যেতে থাকে, একশ' মাইল, দু'শ' মাইল, তিনশ' মাইল, চারশ' মাইল, পাঁচশ' মাইল... কিন্তু আমি সে ট্রেনের বাঁশি কান পাতলেই শুনতে পারি, ট্রেনের বাঁশি সারাজীবন আমাকে তাড়িয়ে ফেরে; কিন্তু আমি তো কোনও মায়ের কোলে শুয়ে

হেক্টরের গল্প শুনি নি, আমার তো কোনও সঞ্চয় নেই যা দিয়ে আমি কিনব ট্রেনের টিকিট, ফিরে যাব আপন ঘরে।

মামুনের মা আমার আর শুভ্রার দিকে তাকিয়ে হাসেন। মামুন বেঁচে থাকতে আমাদের শুধু জানা ছিল সে বেশ বড় ঘরের ছেলে। জানা ছিল না তার বাবা ছিলেন বিমান বাহিনীতে। আর সাতাত্তরে আরও অনেকের সঙ্গে তাঁরও ফাঁসি হয়েছে। স্বার্থপরের মতো মামুন আমার কাছে থেকে জলপাই বাহিনীর হাতে বাবার মৃত্যুনামা রচিত হওয়ার আদ্যোপান্ত শুনে নিয়েছে, কিন্তু তার কথা গোপন রেখে গেছে। আমি মামুনের মায়ের সরু ফ্রেমের চশমার ভেতর নিবদ্ধ চোখে মামুনের অস্তিত্ব খুঁজি। একটা হাই স্কুলের হেড মাস্টারি করতে করতে এখন তিনি বাকি জীবন নিহত স্বামী আর ছেলের স্মৃতিকে নির্জনতায় বিসর্জন দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবেন। আমাদের মুড়ি মাখিয়ে দিয়ে মামুনের মা চা বানাতে থাকেন। তারপর চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়ার পরে বলেন,

তোমরা কেন এসেছ?

আমি আর শুভ্রা একজন আরেকজনের দিকে তাকাই। আসলেই কেন এসেছি আমরা? আমাদের নৈকট্য জাহির করবার জন্যে? সান্ত্বনা দিতে? যে নিঃসঙ্গ ভবিষ্যত তার সামনে অপেক্ষা করছে তার অংশীদার হতে? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই না। মামুনের মা আবারও বলেন,

দেখ, আমি কখনও ছায়া খুঁজি না। মামুনকে আমি এ জন্যে মমতা দিয়ে মানুষ করি নি যে ওর মধ্যে ওর বাবার অস্তিত্ব দেখতে পাব। তোমরা যদি ভেবে থাক তোমরা মামুনের বন্ধু ছিলে বলে তোমাদের মধ্যে আমি মামুনের ছায়া খুঁজে পাব তাহলে ভুল করবে।

আমরা মাথা নিচু করে থাকি। মামুনের মা বলে চলেন,

তোমরা আমাকে ভুল বুঝ না। আমি আমাকে এভাবেই তৈরি করেছি। কোনওদিনই আমি চাই নি একজন ডিফেন্স অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হোক আমার। কিন্তু তাই হয়েছে। আমি যে ছেলেকে ভালবাসতাম সে বাষট্টিতে আর্মিদের গুলিতে মারা গেছে। কাক কাকের মাংস খায় না। কিন্তু ডিফেন্সের লোকেরা খায়। আমার স্বামীকেও খেয়েছে স্বজাতি হওয়ার পরেও। আমি সবসময়েই চেয়েছি মামুন আমার অপমানের প্রতিশোধ নেবে। হয়তো তার পথ ঠিক ছিল না, কিন্তু সে তার মতো করে প্রতিশোধ নিয়ে গেছে। মানুষকে দানবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, এটাই বড় কথা, সে বাঁচবে না মরবে সেটা বড় ব্যাপার নয়। সে যদি না দাঁড়ায় সে যদি প্রতিবাদ না করে তাহলে সে তার মনুষ্যত্বকেই অপমান করে। মানবতাকে পদদলিত করে।

তিনি কাঁদেন না। কিন্তু তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। তাঁর চোখের জলের স্রোত গড়াতে গড়াতে রাজপথে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাদের। রাজপথে কেবলই মিছিল। পিছু পিছু ধেয়ে এল জলপাই বাহিনীর ভ্যান। তারপর গরম পানি। টিয়ার গ্যাস। কিংবা কেবলই গুলি। রক্তের মধ্যে ছিটকে পড়ে আছে কার যেন চশমা, ছেঁড়া ওড়না। মিছিলের মানুষেরা লাশ হয়ে যায়। কিংবা লাশেরাই ফিরে আসে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হয়ে। আবারও লুটিয়ে পড়ে। আবারও ফিরে আসে। লাশের মিছিল শেষ হয় না। মিছিল করতে করতে আমরা পৌঁছে যাই ভার্সিটিতে। যাই আর চিন্তা করি কবে শেষ হবে এই অন্তহীন পথযাত্রা। এতটুকু এই জীবন আমার, একজীবনেই কত স্মৃতি, কত বাহিনী। মুজিব বাহিনী, রাত বাহিনী, রক্ষী বাহিনী, লাল বাহিনী, গণ বাহিনী, জলপাই বাহিনী। বাহিনী দাঁড়ায় সোজা হয়ে। বাহিনী দাঁড়ায় আরাম করে। বাহিনী ডাইনে ঘোরে, বামে ঘোরে, উল্টো ঘোরে। তারপর মার্চপাস্ট করে ডান-বাম, ডান-বাম। তারা এত নিপুণভঙ্গীতে ডান-বাম করে যে আমি একটুও বুঝতে পারি না কখন ডান পা'টা পড়ল, কখন বাম পা'টা। আমাকে মিছিলে দেখে অনেকেই বলে, কোন পার্টি করি আমি। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারি না স্পষ্ট করে। কখনও বলতে চাই, আমি আসলে প্রতিদিনই শোক মিছিল করি। মামুনের শোকে। বাবার শোকে। মামুনের বাবার শোকে। ছাত্ররা কেউ বোঝে না তা, অথবা শেষ পর্যন্ত শোনার চেষ্টা করে না। সবচেয়ে সোজা বুদ্ধি হল, আমি ভাই সাধারণ ছাত্র বলে সব কিছু এড়িয়ে যাওয়া। আমি সেটাই করি।

ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ায় মণীষা আর মায়ের কাছে থেকে বেশ দূরে সরে আসতে হয়েছে আমাকে। কিংবা অনেক আগেই তাদের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম, এতদিন তা বুঝতে পারি নি। মণীষা প্রায়ই চিঠি লেখে, কখনও আমাদের বাঁশবাগানে ঝরাপাতা উড়ে ওঠার কথা, কখনও মাঠে কোনও ফসল না থাকায় অনেক রাতে হা-হা প্রান্তরে জ্যোৎস্নার আলো আছড়ে পড়ার কথা। এইভাবে মণীষা আমার কাছে বেঁচে থাকে, ফিরে ফিরে আসে; আমি মণীষার কাছে বেঁচে থাকি, ফিরে ফিরে যাই। কোথাও কান্নার শব্দ শুনি। আর বাতাসের ফোঁপানি। *আই এ্যাম নো বডি! হু আর ইউ?/ আর ইউ নোবডি, টু?/ দেন দেয়ার্স আ পেয়ার অব আস - ডোন্ট টেল!/ দে'ড ব্যানিশ আস, ইউ নো*। মারিয়া মণীষার চিঠি পড়ে আর সিগারেট টানে। সিগারেট টানে আর এই কবিতা বলে। তারপর আমরা ফাঁকা রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। ঠিক ফাঁকা নয়, রিকশা চলে। দোকানপাট বন্ধ, গাড়ি চলে না, কিন্তু রিকশা চলে। ছাত্রেরা অক্লান্ত গলায় শ্লোগান দিয়ে চলে, *এক দফা এক দাবি/ এরশাদ তুই কবে যাবি*। কিন্তু এরশাদ যেতে চায় না। মিছিলও শেষ হয় না। আমি চমকে উঠি। মিছিলের পর মিছিলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে রগকাটা বাহিনী। তাদের মাথায় টুপি, হাতে কিরিচ-রামদা এমনকি রাইফেল স্টেনগান। বাহিনী মার্চপাস্ট করে, ডান-বাম, ডান-বাম..। আমি একটুও বুঝতে পারি

না কখন ডান পা পড়ল, কখন বাম পা-টা। শুধু শুনি, *এক দফা এক দাবি/ এরশাদ তুই কবে যাবি*। আর দেখি হান্নান হাসপাতালের বেডে, আইয়ুব পঙ্গু হাসপাতালে, টিটোর ডান হাতের কব্জি উধাও। নতুনকে রামদা দিয়ে গলা কেটে ফেলেছে চট্টগ্রামে। রিমুকে কুপিয়ে কুপিয়ে মেরেছে রাজশাহীতে। আমার মুখ দিয়ে শ্লোগান বের হয় না *এক দফা এক দাবি/ এরশাদ তুই কবে যাবি*।

মিছিল থেকে সরে আসতে আসতে আমি মারিয়ার সঙ্গে রিকশাতে উঠি। নিরাপদ রাস্তা দিয়ে ঘন্টাচুক্তিতে ঘুরে বেড়াই দু'জন মিলে। রিকশাওয়ালা বেশ খুশি এরকম অনিশ্চিত দিনে আরোহী পাওয়াতে। তার বয়সী মুখে খুশির আভা সুস্পষ্ট। একবার সে গান গাওয়ারও চেষ্টা করে। একটা টুঙ্গি দোকানের সামনে রিকশা থামিয়ে চা খাই আমরা। তারপর আবারও রিকশায় চড়ার পরে মারিয়া হঠাৎ রিকশাওয়ালাকে বলে,

চাচা, আপনার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন কোনটা বলতে পারেন?

রিকশাওয়ালা হ্যান্ডেল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে প্যাডেল করতে করতে তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনটা মনে করে। তারপর খুকখুক করে হাসতে থাকে,

শেখ সাহেব শহীদ হওয়ার বছরখানেক বাদে এক শুক্কুরবারে বায়তুল মোকাররমে জুম্মার নামাজ পড়তে গেছিলাম। হালার পো গোলাম আযমও আইছিল নামাজ পড়তে। ব্যাটার মাথায় স্যান্ডেল দিয়া একখান বারি মারছিলাম। আরও মারার সখ আছিল। ভিড়ের ঠ্যালায় মারতে পারি নাই। তার জন্যে দুঃখু নাই, ব্যাবাকেরই তো সখআহ্লাদ আছে, না কি কন?

ঘটনার চমৎকারিত্বে আমরা হো হো করে হাসতে থাকি। কেউ প্রথম বেতনের টাকা দিয়ে মাকে শাড়ি কিনে দিয়ে জীবনে সবচেয়ে আনন্দ অনুভব করে, কেউ বলে প্রথম সন্তানের মুখ দেখার স্মৃতির কথা, কারও বা মনে হয় বৃত্তির টাকা দিয়ে বাবাকে পাঞ্জাবি কিনে দেয়ার ঘটনা। কিন্তু এই রিকশাওয়ালার কাছে সেসব কিছুই নয়। কবে সে গোলাম আযমকে ভিড়ের মধ্যে স্যান্ডেল দিয়ে মাথায় একটা বারি মেরেছিল সেটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

কিন্তু রিকশাওয়ালার পরের কথা আমাদের হাসিকে নির্দ্বিধায় হত্যা করে,

আমি তো মুক্তিবাহিনীত আছিলাম, বড়ই সখ আছিল ব্যাটারে জুতা পেটা করার। স্যান্ডেল দিয়া বারি মারবার পারছি এডাই বা কম কি! না কি কন?

আমরা রিকশা থামিয়ে নেমে পড়ি। আমাদের কিছুতেই আর ইচ্ছা করে না এক বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধা রিকশাওয়ালার ঘাড়ে বোঝা হয়ে ঘুরে বেড়াতে। মারিয়া তার ঠিকানাও নিয়ে রাখে। আমি বলি না কি হবে ঠিকানা নিয়ে, কতজনের ঠিকানা নেবে তুমি? মানুষ তো প্রত্যাশা নিয়ে সবকিছু করে না, করে নিজের মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা

দেখাবার জন্যে। আবারও মামুনের মায়ের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে মামুনের কথা। যাদের প্রত্যাশা ছিল তারা তা কড়ায়গণ্ডায় আদায় করেছে। তোমার বাড়ির পাশের বিল্ডিংটার কথাই চিন্তা কর। তুমিই তো বলেছিলে, এক শহীদ বুদ্ধিজীবীর স্ত্রীর নামে বরাদ্দ করা বাড়ি। কিন্তু থাকেন না তিনি। পস এলাকায় তাঁর আরও ভাল বাড়ি আছে। তিনি তাই এটা ভাড়া দিয়ে রাখেন, এখন চেষ্টা করছেন বিক্রি করে দিতে। এরকম কতজন দেখতে চাও তুমি?

আমি বলি না। মারিয়া খুবই কোমল মেয়ে। যদিও জন্ম সোনার চামচ মুখে, বাগিচার ভেতর বড় বড় কাচের জানালা দিয়ে মিষ্টি রোদ আর আলো-বাতাস আসতে পারে এরকম আতুরঘরে। মারিয়ার জন্ম উপলক্ষে এরকম আতুড়ঘরই বানিয়েছিল তার বাবা হাজার হাজার টাকা খরচ করে। ভাল সাঁতার কাটে মারিয়া। কিন্তু প্রশিক্ষক রেপ করার চেষ্টা চালানোর পরে আর ফিরে যায় নি সাঁতারের দলে। এখনও সে-কথা মনে পড়লে সে টলোমলো হয়ে পড়ে, ঘন ঘন সিগারেট টানে, গাঁজাও ধরিয়ে বসে। আর সব সময় সে খুবই স্বাভাবিক, দেখলে মনে হবে মেয়েটা কেবল হাসতে জানে। এরকম মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার কথা নয়, পরিচয় হলেও একসঙ্গে ঘুরে বেড়াবার কথা নয়। যে শুভ্রার গান শোনার জন্যে আমরা সংসদ অফিসে গিয়ে বসে থাকতাম সে শুভ্রা তো এখন এই শহরেই আছে, আমার সামনে দিয়েই হেঁটে বেড়ায়, কই আমার তো একটুও ইচ্ছা করে না ওর সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু মারিয়া আমাকে তাড়িয়ে ফেরে, কোথায় আছি খুঁজে বের করে নেয়, একটুও চুপচাপ বসে থাকতে জানে না রিকশা ছাড়া আর কোথাও। বলে, নিরিবিলি বসলেই লোভ হবে, লোভদের ডানা গজাবে। তারচেয়ে গাছের ছায়ায় হাঁটা ভাল, রাস্তায় রিকশা নিয়ে হুড খুলে ঘুরে বেড়ানো ভাল। আমরা তাই ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরে বেড়াই স্পর্শবিহীন সংলগ্নতা নিয়ে পথে পথে। যেমন ঘুরে বেরিয়েছিলাম প্রথম দিনে। মামুন, আইয়ুব, টিটো, হান্নান, কাশেমদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি ভুলে গেছি আমি। কিন্তু মারিয়ার সঙ্গে পরিচয়ের কথা স্পষ্ট মনে আছে। এ এমন একটা দিন কোনওদিনও ভুলতে পারব না আমি। আমার ভেতরের আমাকে উপড়ে ফেলে দুমড়েমুচড়ে ফেলার দিন সেটা। অথচ সেদিন সকালে উঠে থমথমে আকাশ দেখেও কোনও কিছু মনে হয় নি আমার। লাইব্রেরির কাছে ক্যান্টিনে গিয়ে আয়েশ করে বসে সকালের নাস্তা নিয়েছিলাম আমি। তারপর চা। সেটাতে একটা চুমুক দিতেই বৃষ্টি নেমেছিল ঝমঝমিয়ে। তখনই ক্যান্টিনের রেডিওটায় কে একজন খবর পড়েছিল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মারা গেছেন।

জীবনে সেই প্রথম আমার মনে হল, আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম, আমাকে কেউ নিঃস্ব করে রেখে গেল। যে আমার কৈশোর আর যৌবনকে নির্মাণ করেছে, তাল তাল কর্দমাক্ত মাটিকে অবয়ব দিয়েছে সযত্নে নিপুণ কারিগরের রেওয়াজী দক্ষতাতে, তারপর সে অবয়বকে বালিভাজা রোদে শুকিয়ে জীবনের তামাটে রঙে রাঙিয়ে রেখে

গেছে যাতে কোনও দুঃখই আমাকে স্পর্শ না করে, যাতে আমি শূন্যতায় কান পেতে তার ধ্যানী মৌনী কণ্ঠের স্পর্শ পাই নিতল নিরব নীলকণ্ঠী হৃদয়ের তলদেশে আর সেই কণ্ঠ শুনতে শুনতে ধারণ করি জীবনের ব্যথা আর ব্যর্থতাকে মেনে নেয়ার সাহসিকতা সে আর কোনওদিন তাঁর মাকে বলবে না ভয় পেও না আমরা আছি, এই পৃথিবীর পথে গান গাইবে না কোনও এক গাঁয়ের বধূর, হাসবে না আকাশের দিকে তাকিয়ে, তাঁর গানের স্বরলিপি খাতা পড়ে রইবে প্রত্যাশাহীন জীবনের প্রান্তরে আর খাতার পাতাগুলোয় কেবলই বাতাসের ফোঁপানী শোনা যাবে। এই পৃথিবীতে সবাই বেঁচে থাকবে, এমনকি তেলাপোকাও; বাহিনী মার্চপাস্ট করবে ডান-বাম, ডান-বাম; আমরা কেবলই লাশ হয়ে যাব, মানুষ হয়েও আমরা কেবলই মানুষ-তাড়ুয়া হতে থাকব। মানুষ-তাড়ুয়া বানাতে দক্ষ মানুষগুলো নিপুণ হাতে আমাদের একেকজনকে হত্যা করার পরে টাঙিয়ে রাখবে রাজনীতির ফলবতী মাঠে, ক্ষমতার উর্বরা খেতে, রাষ্ট্রের রাজকীয় মসনদের পাশে, বিপ্লব নামের শব্দটার সঙ্গে,– তাই দেখে দৌড়ে পালাবে জন ও গণমানুষ রাজনীতি, ক্ষমতা, রাষ্ট্র ও বিপ্লব কব্জা করার আকাঙ্ক্ষাকে ফেলে রেখে। এমনকি তাদের হয়ে পথের ক্লান্তি ভুলে শীতল হওয়ার কথা জিজ্ঞেস করার মতোও কেউ আর থাকবে না অবশিষ্ট।

আমার হাতে সিগারেট পুড়ে যেতে থাকে। বৃষ্টির ছাট এসে ছিটকে পড়তে থাকে সস্তা ক্যান্টিনের ঝাপির পাশের টেবিলটাতে। আমি শুনি সপ্রতিভ এক মেয়ে এসে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বলছে,

তুমি ভিজে যাবে তো!

আমি শুনি, কিন্তু তাকে তাকিয়ে ভাল করে দেখতে কিংবা উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকি। মেয়েটা আবারও বলে,

আমি কি তোমার মতো বৃষ্টি দেখার জন্যে এখানে একটু বসতে পারি?

এবার তাকাই আমি। হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা বাড়ার পরে এই এক উটকো ঝামেলা দেখা দিয়েছে,– বৃষ্টি আর জ্যোৎস্না দেখার পাগলামী বেড়ে গেছে শহরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। মধ্যবিত্তদের পাগলামী তাও সহনীয়, কিন্তু যারা একটু উঠতি ধনী কিংবা ধনী তাদের ছেলেমেয়েদের কাণ্ডকারখানাটা আসলেই অসহনীয়। মেয়েটা যে সেই দলের তা বুঝতে একটুও সময় লাগে না আমার তার পোশাকআশাক দেখে। কিন্তু আমি রাগ দেখাতে পারি না। অতএব সে মেয়ে খুব সহজেই আমার সামনে বসে পড়ে। একটু ইতস্ততঃ করে আবার বলে,

আমার নাম মারিয়া, মারিয়া শুভান্বিতা। তোমার?

আমার উঠে পড়তে ইচ্ছা করে। কিন্তু মেয়েটার পুরো নামের মধ্যে পূর্ব আর পশ্চিমের সাবলীল সংমিশ্রণ আমার ইচ্ছাকে কাগজের নৌকা বানিয়ে ভাসিয়ে দেয় বৃষ্টিজলে। ভাসতে ভাসতে তা আকাশ থেকে নেমে আসা বৃষ্টির ভারে ডুবে যেতে থাকে মৃত্তিকার বুকে জমে ওঠা বৃষ্টির মধ্যে। আমি আমার নাম বলে বৃষ্টির মধ্যে সে নৌকার ডুবে যাওয়া দেখতে থাকি। কিন্তু মারিয়া চুপ করে বসে থাকতে পারে না, তার হাসি-হাসি মুখই বলে দেয় যাই হোক না কেন সে চুপ করে বসে থাকতে নারাজ, ঝগড়া করবে তা-ও সই, কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে পারবে না। সে কিছুক্ষণ পরে মৃদু হেসে আবারও বলে,

আমি কিন্তু দেখতে খুব বেশি খারাপ নই।

রাগ চড়ে যায়, মারিয়াকে খুব সচেতনভাবেই অপমান করার ইচ্ছা পেয়ে বসে আমার। বলি,

ভাড়া করতে হবে? রেট কত?

ওর মুখটা কেমন কালো হয়ে যায়। চোখটা টেবিলের ওপর নামিয়ে আহত কণ্ঠে উত্তর দেয়,

ভাড়া করার মতো ছেলে নও তুমি। বোধহয় তোমার মন খারাপ।

হ্যাঁ, মন খারাপ। – আমি চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলি – হেমন্তের নাম শুনেছ কোনও সময়? তিনি আজ মারা গেছেন।

স্যরি, আই'ম এক্সট্রিমলি স্যরি।

বৃষ্টি থামে দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পরে। ততক্ষণ আমি আর মারিয়া চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকি। বৃষ্টি থামলে জলে ভেজা পিচের পথে হাঁটতে থাকি। চারপাশে এখন সবুজের ছড়াছড়ি, বৃষ্টিতে ভিজে গাছের পাতাগুলো আরও সবুজ হয়ে উঠেছে, তাদের কাণ্ড এখন ধূলিমুক্ত, চকচকে। আমি সেদিকে তাকিয়ে হেঁটে চলি। কোনও কথা না বলে মারিয়াও আমার পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। আমরা সারা বিকেল সারা সন্ধ্যা কেবলই হাঁটি, যেন আমরা অনন্তকাল হেঁটে বেড়াব, হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যাব। একবার আমার এ-ও মনে হয় মেয়েটা আসলে পাগল কি না। মনে হতেই আমার রীতিমতো অস্বস্তি লাগতে শুরু করে। অনেক পরে রাস্তার পাশে একটা ফাঁকা রিকশা থামিয়ে আমি ওকে বলি,

চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মারিয়া শান্ত মেয়ের মতো আমার সঙ্গে রিকশাতে চড়ে। রিকশাওয়ালাকে শ্যামলীর দিকে যাওয়ার কথা বলে। আমি আবারও সিগারেট ধরাই। সায়েন্স ল্যাবরেটরি

পের নোর পরে চিন্তা করি পাগলামী বহু হয়েছে, আমি এবার নেমে পড়ব। ঠিক তখুনি মারিয়া বলে ওঠে,

অনেকদিন পরে আজ আমি এতক্ষণ চুপচাপ হেঁটে বেড়ালাম। – বলে সে একটু থামে, আবারও কথা বলা শুরু করে – আমি একসময় খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারতাম। ইচ্ছা ছিল চ্যানেল বিজয় করব ব্রজেন দাশের মতো। কিন্তু হল না তা। একদিন প্র্যাকটিসের সময় আর কেউ না আসার সুযোগে কোচ আমাকে রেপ করার চেষ্টা করে। তারপর থেকে সাঁতার একদম ছেড়ে দিয়েছি। এখন লেখাপড়া করতেও ভাল লাগে না। আমার অবশ্য প্রিয় জন ডেনভার, তবে আমার মা'র হেমন্ত খুব প্রিয় ছিল। অনেকদিন পরে আজ আমার মা'র কথা মনে হল।

আমি অজান্তেই একটা হাত মারিয়ার কাঁধে রাখি। সারা রাস্তা আমরা আর কোনও কথা বলি না। শুধু সেই একদিন। পরে যতবারই আমি আর মারিয়া একসঙ্গে বেরিয়েছি, বোধহয় এমন কোনও মুহূর্ত নেই যখন আমরা কথা না বলে চুপ করে থেকেছি। আমি তেমন কথা না বললেও মারিয়া অনর্গল কথা বলে গেছে, কথা বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়েছে। আর আমাকে কিংবা আমাদের হাসতে বাধ্য করেছে। অবস্থা এমন হল শেষ পর্যন্ত যে মারিয়াকে দেখলেই টিটোরা বলত, ওই যে আসছে তথাগত'র লাফিং গ্যাস। আমরা আমাদের প্রলুব্ধ না করার জন্যে বসতাম না, হেঁটে বেড়াতাম, কিন্তু ক্রমশঃই বুঝতে পারছিলাম আমাদের মনের গহনে লোভের ফুলকি বড় হচ্ছে, যে কোনওদিন সে তার লেলিহান শিখা মেলে ধরবে। আমরা আমাদের আর প্রতিরোধ করতে পারব না, নিজেদের আগুনে নিজেদের বিশুদ্ধ হতে হবে।

তারপরও এটাই সত্যি, মারিয়া নয়, আমি জীবনে প্রথম স্পর্শ করেছিলাম মণীষাকেই।

আকাশ ফর্সা হয়-হয় সকালে আমি মণীষার কপালে চুমু দিয়েছিলাম। ঘরের মধ্যে তখনও আলো-আধারীর খেলা আর সৎ-মাও নেই যে সাতসকালে থালাবাসন হাড়িপাতিল ধোয়ার জন্যে উঠে পড়ার পায়তারা করবে। অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিলাম আমি। মণীষাকে ডেকে তুলে বাসি ভাত আর তরকারি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে পড়তে মনেও হয় নি ও বিবিসি শুনেছে কি না জিজ্ঞেস করার কথা। সারা

শরীর-মনে তখনও লেগে আছে রাত জাগার ক্লান্তি আর বন্ধুরা ঠিকমতো বাড়ি ফিরেছে কি না সেই উদ্বেগ। কাঁদুনে গ্যাসের ঝাঁঝে আমাদের মুখ হা হয়ে গিয়েছিল, প্রলম্বিত লয়ে নাকের বদলে সেখান দিয়েই নিশ্বাস নিচ্ছিলাম বারে বারে। কোথাও কোনও জলাশয়ও ছিল না যে একটু পানি দিয়ে চোখের পর্দাটা ভিজিয়ে নেব। কখনওবা গরম লাল পানি ছুঁড়ে দিচ্ছিল হোস পাইপ দিয়ে ওরা রায়ট কারে বসে। আমাদের গা পুড়ে পুড়ে যাচ্ছিল, বড় বড় ফোস্কা মুখ উঁচু করছিল এক লহমায়। বিবিসি কিংবা ভোয়া অথবা অন্য কোনও বার্তা সংস্থা তার কতটুকুই বা বলতে পেরেছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে! তাদের ধারাভাষ্য তো সীমাবদ্ধ থাকে ঘটনার সূত্রপাত, ধারাবাহিকতা আর ক'জন কি ভাবে মারা গেল সেই পরিসংখ্যানের ভেতর। এর সঙ্গে চাটনি হিসাবে কোনও কোনও নেতার হামবড়া কথাবার্তা,- যা জলপাই বাহিনীর সঙ্গে মারামারির সময়ে আমাদের কাজে লাগে নি আর এখন ভার্সিটি বন্ধ হওয়ার পরে তো আরও কাজে লাগবে না।

সাঁজোয়া গাড়িগুলো হঠাৎ করেই এসে হাজির হয়েছিল। তার আগে প্রতিদিনকার মতো দশ-বিশটা ঠোলাও অবশ্য এসে দাঁড়িয়েছিল বটতলাতে। আমরা মিছিল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম শিক্ষা ভবনের দিকে। সাজোয়া গাড়িগুলো ধীরে ধীরে শান্ত কচ্ছপের গতি সম্বল করে হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে তেড়ে এসেছিল আমাদের পিছু পিছু। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় নি মিছিলের ওপর ট্রাক তুলে দিচ্ছে সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা। হয়তো তখুনি মারা যাব, আর কোনওদিন দেখব না এই পৃথিবীর সবুজ পাতা দুলে ওঠা, শিউলি ফুলের মতো বালিকারা আর কখনও-ই এসে হয়তো বলবে না, এক গ্লাস পানি দশ পয়সা, আপনাদের জন্যে বিনা পয়সা। আমার কিন্তু এসব মনে হয় নি। মনে হয়েছিল যে ট্রাক মিছিলে তুলে দেয়ার অর্ডার দিয়েছে সে কি কখনও এই ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল? না কি তার আগেই লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে কমিশন্‌ড্ র‍্যাঙ্কে ঢুকে প্রমোশন পেতে পেতে এখন মানুষ হত্যার লাইসেন্স পেয়ে গেছে? একবার পাশে টিটোকে দেখতে পেয়েছিলাম। স্যান্ডেল জোড়া ঢুকিয়ে নিচ্ছিল জিন্‌সের প্যান্টের পেছনের পকেটে। চোখে চোখ পড়ায় হেসেছিল একটুখানি। ও এইরকমই। আমাদের সবসময়ে বলে, টাকা পয়সা হলে হরেক রকম জুতোর একটা লাইব্রেরি করব। শালার বড় বড় অফিসারদের রুমে ঢুকলেই পায়ের দিকে তাকায়। যার জুতো যত বেশি চকচকে তার না কি তত বেশি কদর! আর এক-একটা জুতোর দামও বলিহারি, কষ্ট করে কেনার পরে মনে হয় এত দামী জিনিস, পায়ে দিয়ে নষ্ট না করে গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াই। হলের রুমে ও জুতো রাখার একটা স্ট্যান্ড কিনে দরজার কাছেই রেখে দিয়েছে। ওপরে আবার কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢাকা। কেউ কোনও কৌতূহল দেখালে সে একেবারেই স্বাভাবিক গলায় বলে,

নিজেরা খেয়ে না-খেয়ে থাকি কোনও অসুবিধা নাই, কিন্তু এত দাম দিয়ে কেনা জুতোগুলোকে তো ভালভাবেই রাখা দরকার।

সেই টিটো যে জলপাই বাহিনীর ধাওয়া খাওয়ার পরেও জিন্সের পকেটে টুক করে স্যান্ডেলটা ঢুকিয়ে নেবে তাতে আর সন্দেহ কি! আমি সামনের দিকে যেতে যেতে ওর পকেটের মধ্যে জুতোর মাথাটার নড়াচড়া দেখতে দেখতে জলপাই বাহিনীর ট্রাকের ড্রাইভারটা ভাবলেশহীন মুখে আবারও তেড়ে আসছে। এবার তার গতি আরও হিংস্র। চটজলদি চাপা গলির মধ্যে ঢুকতেই বুঝে নিয়েছিলাম কেন এত হিংস্রতা ওর চাকায়। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে যাওয়া লাশ ছিনিয়ে নেয়ার তাড়নায় ওরা ছটফট করছে এখন। ছাত্রেরা কয়েকজনের পিষ্ট দেহ নিয়ে চাপা গলিতে ঢুকে পড়েছে। অনেকক্ষণ দৌড়ানোর পরে ছাত্রেরা একটি পরিত্যক্ত বাসা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। অপরিচ্ছন্ন ময়লা ধূলি জমা মেঝের ওপর শুইয়ে দেয়া হয় তাদের। ওদের শরীর থেকে নির্গত রক্ত ততক্ষণে বহনকারীদের শরীরকেও ভিজিয়ে তুলেছে। আমি কোথায় যাব না যাব ঠিক করার আগেই ওদের পিছু পিছু পরিত্যক্ত বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ি। তখনই বুঝতে পারা যায় দু'জন ছেলে একেবারেই মারা গেছে। একজনের পকেট খুঁজে পাওয়া যায় গ্রামের বাড়ি থেকে আসা চিঠি। ছেলেটার বৌয়ের ক'দিন আগে প্রথম সন্তান হয়েছে, তাড়াতাড়ি যেন বাড়ি যায় সে।

আমরা যারা মিছিলে ছিলাম তারা ছেলেটার এই চিঠি পড়তে পড়তে একই সঙ্গে উত্তেজিত ও ম্রিয়মান হয়ে পড়ি। ছেলেটার বন্ধু ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে, বলে, এই প্রোগ্রামটা করার পরেই ওর বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। তাছাড়া একটা চাকরিও খুঁজছিল ও। সত্যি সত্যিই বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ও, তবে নবজাতকের মুখ দেখতে নয়, নবজাতকের মা-কে রুদ্ধশ্বাস কান্নায় আকুল করে তুলবে বলে। আমি কেউকেটা কেউ নই, কোনও দলও করি না, নেহাৎ সংগ্রাম পরিষদের মিছিল জন্যে ছিলাম। হঠাৎ আমি হাঁটিতে শুর   করি কাউকে কিছু না জানিয়েই। মনে হয় হাঁটছি না, রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা পড়ছি আপন মনে। এই পড়া শেষ হবে না ঘুমিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। তড়িঘড়ি করে হলে ফিরে দেখি, ইউনিভার্সিটি ক্লোজড সাইনে ডাই, চেনাজানা প্রায় সবাই চলে গেছে। তারপর কোনও রকমে ব্যাগটা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ি। রাস্তা ফাঁকা। মেয়েদের হলের সামনে দাঁড়িয়ে ছোটবোনকে নিয়ে রিকশার দরদাম করছে টিটো। রিকশাওয়ালা কমলাপুর যাওয়ার জন্যে ত্রিশ টাকা ভাড়া চাইছে। এই এক স্বভাব ওদের, পুলিশের কিংবা অন্য কোনও হাঙ্গামায় ইউনিভার্সিটি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিকশা ভাড়া বাড়িয়ে দেয় চারগুণ পাঁচগুণ। টিটো রাগে কড়মড় করতে করতে হঠাৎ জিন্সের প্যাকেট থেকে স্যান্ডেল স্যু-টা বের করতে গিয়েও থেমে যায় এখন পরিস্থিতি অনুকূলে নয় মনে পড়াতে।

আমার মণীষাকে মনে পড়ে। বিবিসি-তে এই ট্রাক চাপা দেয়ার ঘটনা ও আদৌ শুনেছে কি না কিংবা শোনার পরে আমার অপেক্ষায় জেগে বসে থাকবে কি না সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। টিটোরা কোনওমতে একটা রিকশা ঠিক করে চলে যাওয়ার পরেও আমি কি করব ঠিক করতে পারি না। একবার ভাবি হাঁটতে হাঁটতে সালাহউদ্দিন ভাইদের বাসায় চলে যাব। কিন্তু তাদের বাসায় ডাইনিং রুম মিলিয়ে মাত্র তিনটা রুম চিন্তা করতেই বিরতি দেই ও চিন্তায়। একটা ট্রাকে আরও অনেক ছাত্রের সঙ্গে গিয়ে পৌঁছাই আরিচা ঘাটে। সেখান থেকে লঞ্চে দৌলতদিয়া। তারপর আবারও ট্রাক। গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে সেই ট্রাক-শ্বাপদ সাধারণ যে কোনও বাসের চেয়ে তাড়াতাড়িই আমাকে বাড়ির কাছাকাছি সড়কটায় নামিয়ে দিয়েছিল। সেটা কোনও বাসস্ট্যান্ড নয়, কিন্তু সেখানে নামলে আমি দ্রুত বাড়ি পৌঁছাতে পারব এই ধারণায় নেমে পড়েছিলাম আমি। অন্ধকার রাতে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে রওনা দিয়েছিলাম বাড়ির দিকে। সড়ক থেকে অনেকটুকু অপ্রশস্ত রাস্তা পায়ে হেঁটে ইউনিয়ন বোর্ডের হেরিং করা রাস্তা পেয়েছিলাম। তারপর কাঁচা সড়ক। রাতে অন্ধকারে রাস্তায় হাঁটার অন্যতর অনুভূতি আমাকে বিস্মিত করেছিল। বোধহয় সে জন্যেই কোনও ক্লান্তি বা বিরক্তি পেয়ে বসে নি। কাঁচা সড়ক দিয়ে নেমে আলপথে বাড়িতে যেয়ে মণীষাকে ডাক দিয়েছিলাম আমি। প্রতিবারই এরকমই হয়। কখনও মাকে এত জোরে জোরে ডাকা হয় না আমার। মা আমার এত জোরে ডাকাডাকি প্রত্যাশা করে কি না তাও জানা হয় নি কোনও সময়। মণীষা যখন বলেছিল, মা বাড়িতে নেই তখন একটু অবাকই হয়েছিলাম আমি। মা'র তো যাবার মতো তেমন কোনও জায়গা নেই। মামাবাড়ি কোথায় মণীষাও বলতে পারবে না মেরে তক্তা বানিয়ে ফেললে। কোথায় গিয়েছে মা সে প্রশ্নেরও কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলে নি মণীষার কাছে থেকে। শুধু বলেছে মা এলে আমাকেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে। আর আমি ভেবেছি মণীষার বিয়ের জন্যে মা নিশ্চয়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারপরেও মাঠের মধ্যে এই ফাঁকা বাড়িতে মণীষাকে একা ফেলে যাওয়াতে একটু ক্ষুব্ধই হয়েছি মনে মনে।

ভোরে যখন আলো-আঁধারি, পুরানো অভ্যাসবশতঃই ঘুম ভেঙে যায় আমার। আবার অবসাদে পাশ ফিরে শুই। তখুনি মণীষাকে চোখে পড়ে। শুয়ে আছে অর্ধনারীশ্বরের বিমুগ্ধ ভঙ্গিমাতে। তার আবছায়া শরীর দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ে কোনও একদিন মুখের ভাষা ফুরিয়ে দেহের ভাষা জেগে ওঠার কথা, দেহের সে ভাষাকে হত্যা করে আবারও মুখের ভাষা ফিরিয়ে আনার কথা। যেন মণীষা নয়, অন্য কোনও মায়াবী মেয়ের কথা ভেবে চলি আমি। এই মেয়ে, এই মায়াবী মেয়ে, আমার চারপাশ যাকে ভাবতে শিখিয়েছে বোন হিসাবে সে চলে যাবে অন্য কোথাও, কয়েকজন মানুষের উপস্থিতিতে কয়েকবার কবুল বলার যোগ্যতায় তাকে অধিকার করে নিতে পারে এমনকি একটি শুয়োর, কুকুর। সাতসকালে আমার ভেতরটা নড়ে ওঠে। আমি

গিয়ে দাঁড়াই মণীষার শিয়রের পাশে, কিংবা হেমন্তের চাঁদ এসে দাঁড়ায় শিশিরসিক্ত সবুজ মাঠের পাশে। আমি বসে পড়ি মণীষার মাথার কাছে, কিংবা অনন্ত সবুজ আরও সবুজ হতে ডেকে নেয় সূর্যরশ্মিকে।

মণীষা আমার হাতের মধ্যে থির হয়ে থাকে। তারপর মাথা নামিয়ে রাখে আমার বুকের ভেতর। একটু পরে মাথাটা তুলে একটু সলজ্জ হেসে ওড়না ঠিক করতে করতে বিযুক্ত হয় আমার সংলগ্নতা থেকে। তারপর বলে,

চল, আলপথে হেঁটে পায়ে শিশির লাগাই।

অনেকদিন পরে আমরা শিশিরে ভিজি। পায়ের পাতা থেকে শিরশির ভাললাগা উঠে আসে আমাদের চুলের ডগায়। আমি জলপাই বাহিনীর গল্প বললে মণীষা বেশ মজা করে সুকুমারের *অবাক জলপান* বলে চলে একা একাই। *জলপাই? এই ঠাণ্ডার দিনে জলপাই কোথায় পাবেন মশাই*। সারাদিন কোথাও বের হই না আমি। যেন আমরা দুই .... দুরন্ত বালকবালিকা বাড়ি থেকে পালিয়ে কাছাকাছি কোনও জঙ্গলের মধ্যে পিকনিক করছি চুপে চুপে। আমি আনছি পানি টেনে, জোগাড় করছি কাঠ কিংবা শুকনো পাতা, আর মণীষা চুলা জ্বালছে, পাতিল চড়াচ্ছে।

কিন্তু মা সারাদিনেও ফিরে আসে না। আমি অবাকই হই। বাড়িতে একটা কাজের মেয়েও নেই, অথচ মা মণীষাকে রেখে দিব্যি নির্বিবাদে কোথায় গিয়ে আছে! রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ হলে আমি বলি মণীষাকে,

ঠিক করে বলতো, মা কোথায় গেছে?

বললাম তো, এলে নিজেই জিজ্ঞেস কর। – মণীষা একমনে বিছানা বালিশ ঝাড়তে থাকে। তারপর আবারও বলে – বাড়িতে তো আসো না। বাড়ির খোঁজখবরও রাখ না। এবার একটু মতিগতি ঠিক কর। না হলে দেখবে একসময় আমরাও নেই, বাপের ভিটাটাও হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

আমি সিগারেট টানতে টানতে বাঁশবাগানে এসে দাঁড়াই। মণীষা একথা বলল কেন ঠাহর করতে পারি না। না কি এর মধ্যে অন্যরকম কোনও ঘটনা ঘটেছে, যা মণীষা নিজে থেকে জানাতে চাইছে না? সারাদিন বাড়ির মধ্যে বসে থেকে তবে কি আজ আমি ভুল করলাম? এমন কিইবা ঘটতে পারে যা মণীষা জানাতে চাইছে না? এবং বাপের ভিটেও হাতছাড়া হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে?

মণীষা এসে আমার পাশে দাঁড়ায়,

তুমি আবার কবে যাবে?

আমি হেসে ফেলি,

কেন বললাম না, ক্লোজড সাইনে ডাই?

মণীষাও হাসে,

ভালই হল। শোন ভাই, ইয়ার্কী না। তুমি বাড়ির দিকে মন দাও একটু। মাঝে মাঝে আমার খুব ভয় হয়। লোকজন এত হিংস্র হয়ে উঠেছে! খুনোখুনি লেগেই আছে। এত লোভ! কবে আমাদের মেরে কেটে এসব দখল করে নেয় ঠিক আছে? রাতে যা ভয় করে! কখনও কারও পায়ের আওয়াজ শুনলে আর ঘুমাতে পারি না। সারা রাত জেগে থাকি। পেপারে একেকটা নিউজ পড়ি আর শিউরে উঠি। জমিজমাতে তোমার মনযোগ নেই, মা কি দিয়ে কি চিন্তা ভাবনা করে শুনলেই আমার মাথা গুলায়।

কি চিন্তাভাবনা করে মা?

মা চিন্তা করে,– চিন্তা করে, সত্যিই তুমি যদি তাড়িয়ে দাও কোনও সময়, অথবা কোনওদিন আর ফিরে না আসো, আর সেই সুযোগে যদি আর কেউ এসব বেদখল করে নিয়ে আমাদের তাড়িয়ে দেয়... চিন্তা করে... আমি এসব বলতে পারব না ভাই, আমি দিব্যি কেটেছি, ভাবতে গেলেই আমার গা শিউরে ওঠে.. প্লিজ মাকে বল না আমি বলেছি এসব.. প্লিজ বল না এসব।

আমি মণীষার পিঠ চাপড়াই। কেন জানি না সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে থাকি। অসংলগ্ন প্রশ্ন জাগে মনে, মা'র বয়স কত এখন? এতদিনে তো মেনোপোজ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তার সঙ্গে কি দৈহিক আকাঙ্ক্ষার কোনও সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে? ডাক্তাররা তো এ-ও বলে মেনোপোজের পরে কার কার যৌন আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায় আরও তীব্রভাবে। অথবা মা কি পাগল হয়ে যাবে? নইলে আমি তাড়িয়ে দেব এরকম চিন্তা তার মনে আসল কেমন করে? আমি এসব এলোমেলো চিন্তা দূর করার জন্যে মণীষার চুলের গভীরে হাত চালিয়ে টান দেই আস্তে করে,

আসলে মা তোর বিয়ের চিন্তায় পাগল হয়ে গেছে। মনে হয় কারও সঙ্গে কোথাও কোনও ছেলের খোঁজ নিতে গেছে। কি, ঠিক বলি নি?

না, ভাই। সেসব না। আমি– আমি বলতে পারব না।

আমরা পাশাপাশি বসে পড়ি পাতলা ঘাস আর ঝরে পড়া বাঁশ পাতার ওপর। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এসেছে। আমাদের অবয়ব জোড়া স্থানটুকুকে মনে হয় আরও তীব্র অন্ধকারে ঠাসা। শীতকাল চলে গেলেও তার রেশ এখনও কাটে নি এতটুকু। কোথাও পাখি ডাকে না। কেবল একটা শেয়ালের ডাক শোনা গেলে মণীষা আমার আরও কাছে সরে আসে। কখনও সানতুর শুনেছি কি না প্রশ্ন করে। আমরা শিবকুমার শর্মার কথা বলি। ভেবে দেখি এখন যদি কোথাও শোনা যেত চৌরাশিয়ার বাঁশি, তাহলে কেমন লাগত দু'জনার। বাজারে নতুন বই এসেছে *নো ওয়ান রাইটস টু দ্য*

কর্নেল, তা এখনও না আনায় মৃদু অনুযোগ করে মণীষা। পুরানো বইয়ের গল্প করে, বলে কলেজের লাইব্রেরিতে কেউ না পড়তে পড়তে হলদে হয়ে যাওয়া গল্পের বইয়ের কথা। আমার হাতের ডানায় মুখ ঠেকিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকে তারপর। আর রাত বাড়তে থাকে, সঙ্গে অন্ধকারও। কত রাত জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেরিয়েছি আমরা, কিন্তু অন্ধকারে বসে থাকা এই প্রথম। সে আধারে আকাশের একেকটা তারা জ্বল জ্বল করে সারা শরীরে পূজোর কৃষ্ণকালো বেদীতে নিবেদিত শিউলি ফুলের শুভ্র বর্ণ লেপ্টে নিয়ে। মণীষা হঠাৎ কাঁপা কাঁপা গলায় অস্বাভাবিক মরিয়াপণা নিয়ে বলে ওঠে,

সত্যেন সেনের পাপের সন্তান পড়েছ তুমি?

আমার হাতের ডানায় মণীষার হাতের আঙুল শক্ত হয়ে চেপে বসে। আমার হাতের আঙুলগুলো জড়িয়ে নিতে থাকে মণীষার দীর্ঘচুলের রাশি শক্ত করে। একটা লড়াকু ঘোড়া দুর্দমনীয় তেজে দৌড়াতে থাকে তেপান্তরের মাঠে, তার ঘোড়সওয়ার শক্ত মুঠোয় চেপে ধরতে থাকে ঘোড়ার কেশর। অন্ধকার আরও ঘন হয়ে তাদের লুকিয়ে ফেলে পৃথিবীর যাবতীয় তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষা করবে বলে। আর অন্ধকারের ছাইয়ের তলে আমাদের দু'জনের শরীর চকমকি পাথরের তীব্রতায় ঘর্ষণে ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে তোলে কোনও একদিন দাবানল হয়ে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলার প্রত্যাশাতে।

ঘরে ফিরে মণীষা মোমের বাতি জ্বালে। বাতাসে কাঁপতে থাকে মোমের আলো। আমার হাতটাকে করতলে নিয়ে মণীষাও কাঁপতে থাকে,

আমাকে খারাপ ভাবছ তুমি?

আমি নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকি কম্পমান মণীষার অশরীরী আলোর দিকে,

আর আমাকে?

তারপর আমরা আমাদের যাবতীয় নিরুপায়তা নিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ শুয়ে থাকি। অনেক পরে মণীষা আত্মগত স্বরে কথা বলে ওঠে, মনে হয় দূরে কোথাও পাহাড়ের খাড়িতে সমুদ্রের গর্জন মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে,

এই চেয়েছি আমি, পেয়েছিও। আর কিছু চাইবার নেই। ব্যবহৃত পূজোর ফুল নিয়ে এখন যার যা ইচ্ছা তাই করুক, ভাসিয়ে দিক ফেলে দিক পায়ে মাড়াক, কোনও দুঃখ নেই আমার।

কেন যে মণীষা বলে এই কথা! ব্যাখ্যাতীত এক আশংকায় আমি অস্থির হয়ে উঠি। আমার পালকের নিচে লুকিয়ে ফেলতে চাই ওকে। ও একবার ফুঁপিয়ে ওঠে। তারপর আমাকে শক্ত করে জাপটে ধরে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে উঠে দেখি আমাদের গ্রামখানা উরুবেলা হয়ে গেছে, কাঁধের কাছে হাতের মুদ্রায় পায়সান্নের থালা নিয়ে অরণ্যচারী নারীদের ভঙ্গিমায় শাড়ি পরে এগিয়ে আসছে মণীষা আমার দিকে। আমি তখন কেবল পাতকুয়াতে বালতি দিয়ে পানি তুলে গোসল শেষ করে বসেছি কাঠাল গাছের নিচে রোদের মাঝে। কবেকার সেই উরুবেলার সুজাতার কথা রপ্ত করে নিয়েছে সে এরই মধ্যে। কিংবা সুজাতাই আবার ফিরে এসেছে পৃথিবীতে নতুন করে জন্ম নেয়া তথাগত'র আবারও সম্বোধীপ্রাপ্তি ঘটাবে বলে। থালা নামাতে নামাতে মণীষা না কি সুজাতা বলতে থাকে,

প্রভু, আমি আপনার জন্যে সহস্তে প্রস্তুত করেছি এই পায়সান্ন। এই পায়সান্নের মধ্যে আছে চাল, যা পুরুষ জাতীয়, এবং দুধ, যা স্ত্রী জাতীয়। আমি নারী আপনাকে এই পায়সান্ন প্রস্তুত করে খেতে দিচ্ছি, এতে আপনার শক্তি এবং বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ ঘটবে এবং সেই পথেই আপনি সম্বোধী লাভ করবেন।

নৈবেদ্য দেয়ার ভঙ্গীমায় আমার সামনে বসে পড়ে মণীষা। দেখতে থাকে আমার পায়সান্ন খাওয়া।

মা ফিরে আসে বেলা ন'টার দিকে। আমাকে দেখে একটু চমকে ওঠে। তারপরই তার মুখে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। মার মুখে লাবণ্য ফিরে এসেছে, যেরকম লাবণ্য ফিরে আসে শ্যাওলাপড়া পাথর ঝরনাধারায় অবিরাম ধুয়ে ধুয়ে। আর প্রচুর পান খাওয়াতে মুখ লাল টকটকে। আমিই প্রশ্ন করি,

কই গিয়েছিলে মা?

মা হাসে,

কেন বলে নি মণি?

বলল না তো। শুধু বলল তুমি এলে জেনে নিতে।

মা তার শাড়ি গুছিয়ে বসে, যেন ধূলোবালি প্রচুর, নষ্ট হয়ে যাবে। একটা পান বের করে মুখে পুরে দিয়ে একগাল হেসে বলতে থাকে,

আর বলিস না। তোর বড় চাচা এসে নিয়ে গেল। কিছুতেই ছাড়ল না। বলে, আমার বাড়িতে আত্মীয়স্বজন সব এসেছে। তুমিও তো আত্মীয় বৌমা। চল, কয়েকদিন থেকে আসবে। এত জোরাজুরি করলাম মণিকে কিছুতেই গেল না। বললাম, কাজের মেয়েটাকেও তো এ ক'দিন তোর চাচার বাড়িতেই ফাইফরমাশ খাটতে হবে। বাড়ি ভরা মানুষজন, না নিয়ে গেলে কেমন দেখায়! ফাঁকা বাড়িতে তোর তো ভয় লাগবে। কিন্তু আমার কথা কানেই তুলল না। বলল আমি একা একাই থাকতে পারব।

আমার মুখে প্রথমে কথা যোগাল না। বড় চাচার বাড়িতে যেয়ে মা পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে এল, যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরে আর কখনও যায় নি আমার বাবা, যে বড় চাচা এসে মা আর মণীষাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমাকে দিয়েছে ওদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার পরামর্শ! সেই বড় চাচার বাড়ি গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে এল মা মণীষাকে রেখে নির্বিবাদে! আমি কোনওমতে কেবল বলতে পারি,

তুমি বড় চাচার বাড়িতে গিয়েছিলে!

যেতে অসুবিধা কোথায়?– মা ঝংকার দিয়ে ওঠে।– তুই তো থাকিস না। আত্মীয়স্বজন ছাড়া টিকে থাকা যায়? বর্গাদারদেরও খুব বাড় বাড়ছে। আর মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে না? আত্মীয়স্বজনরাই তো করে এসব। পুরানো ঝগড়া পুষে রেখে লাভ আছে কোনও?

তাই বলে তুমি এইভাবে নিজের মেয়েকে একা একা ফেলে রেখে চলে যাবে? রাতের বেলা কাজের মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলেও না হয় এক কথা ছিল।

কাজের মেয়ে এখানে থাকতে আসবে কোন দুঃখে? নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে তার। দুই দিন বাদে স্বামী মনুষ্যির হাটে গিয়ে বিক্রি হবে। সে এখন তোমার আদরের বোনকে পাহারা দিতে আসবে কেন? আর তোমার বোনের জেদও তো কম না। তো থাক জেদ ধরে। আমার কি!

বলে মা মুখ ঘুরিয়ে আয়েশ করে পান চিবুতে থাকে। আমি ঝিমধরা মাথা নিয়ে বসে থাকি আর মাটির ওপর আঙুল দিয়ে এলোমেলো আকিবুকি কেটে চলি। মনে হয় আসলেই আমার সম্বোধীপ্রাপ্তি ঘটে। বেশিদিন থাকতে পারি না, অসহ্য লাগে। এক সকালে উঠে রওনা হই ঢাকার দিকে। মাকে বেশ খুশিই লাগে আমি ঢাকা যাচ্ছি শুনে। কেবল মণীষা বিমর্ষ হয়ে ওঠে। আমার পিছু পিছু এসে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি যেতে যেতে না তাকিয়েও বুঝতে পারি এক জোড়া চোখ আমার পিঠের ওপর সেঁটে আছে। তখন পা আটকে আসে। কিন্তু আমি আর পিছু ফিরি না।

রগকাটা বাহিনী ততদিনে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভাবখানা এই যে জলপাই বাহিনী তাদেরও মহাশত্রু। তারাও তাই ঘুরে ফিরে মিছিল করে, মিটিং করে। কেউ কিছু বলে না। আমাদের মধ্যে কেউ আর চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে যেতে সাহস পায় না, কেউ আর তাদের আত্মীয়স্বজনদের পরামর্শ দেয় না ভর্তি হও চিটাগাং ভার্সিটিতে। পঙ্গু হাসপাতালে মারিয়াকে নিয়ে এক বিকেলে আইয়ুবকে দেখতে গেলে তার চোখে পানি জমে ওঠে। রগকাটা বাহিনী তার ওপর চড়াও হয়েছিল রাজশাহী ভার্সিটিতে। সেখানকার ডাক্তাররা তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছে। এখন সে পঙ্গু হাসপাতালের অবসন্ন বেডে আচ্ছন্নতার মধ্যে শুয়ে থাকে দিনরাত। সূর্যের আলো আসে না, দিনের বেলায়ও

টিউব লাইট জ্বালতে হয় সেখানে। আমরা গিয়ে বসলে অনেক পরে সে আচ্ছন্ন চোখ মেলে ধরে। জল জমতে জমতে তার চোখ থেকে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে,

আমি আর কোনও দিনও হাঁটতে পারব না রে।

আইয়ুবের গলা বুজে আসে কান্নায়। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার কোনও মানে হয় না। তবু আমি আইয়ুবের হাত ধরে বসে থাকি, মারিয়া চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। তাতে যেন ওর দুঃখ আরও উথলে ওঠে,

প্রথম দিকে লোকজন দেখতে আসত। এখন তা-ও আসে না।

মানুষের পরিণতি তবে এইরকম! সঙ্গ খুঁজতে যাওয়া, তারপরও নিঃসঙ্গতার বিবরে যাত্রা করা। আমি কথা খুঁজে পাই না। পুরানো দিনের দু'একটা স্মৃতি খুঁজে এনে আমাদের অতীতের আনন্দ নতুন করে নিংড়ানোর চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে বিষণ্ণতা আরও বেড়ে চলে আইয়ুবের। একবার বলি,

নিশ্চয়ই আইয়ুব খান ক্ষমতা নেয়ার পরে তোর জন্ম হয়েছে? নইলে তোর নাম আইয়ুব হবে কেন?

তাই হবে হয়তো। আর তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আমাকে আরেক আইয়ুব খানের আমলে পায়ের রগ কেটে ফেলতে দিয়ে।

বলে আইয়ুব একেবারেই চুপ হয়ে যায়। এক নার্স এসে কি একটা ইনজেকশন দিয়ে যায় ওকে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে আইয়ুব। আমরা বেরিয়ে আসি। সন্ধ্যা নামার পরেও মানুষজন ব্যস্ত ভীষণ, কাজ নেই কেবল কলেজ রোডের বিশাল কড়ইগুলোর। অসীম ধৈর্য নিয়ে রিকশা আর গাড়ির আওয়াজ শুনছে তারা। রাস্তার ধারের একটা চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে আমরাও তাদের অনুসরণ করি। কবে এই দিন শেষ হবে, কবে জলপাই বাহিনী, রগকাটা বাহিনী বিলীন হবে মুজিব, রক্ষী কিংবা গণবাহিনীর মতো কালের কালো গহ্বরে সে কথা কেউ বলে না। শুধু একদিন ঢাকা নগরী জেগে থাকে সারা রাত। ছোট ছোট মিছিল রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে বেরিয়ে পড়ে। জলপাই বাহিনীকে কোথাও দেখতে পাই না আর। নিজেদের পোশাক তারা লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদেরকে বিরত করে জননেতারা। তারা বলে, আপনারা আমাদের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। আপনাদের বিরুদ্ধে তো কোনও অভিযোগ নেই আমাদের। আমাদের অভিযোগ ওই পল্লীবন্ধুকে নিয়ে, সে আমাদের কবির তকমা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল, দুধেল নারীদের নিয়ে সে উৎসব করত। সে চলে গেছে, গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে, জিরো পয়েন্টে দাঁড়িয়ে যে যুবক প্রাণ দিয়েছিল বুকে পিঠে এই গণতন্ত্র মুক্তির দাবিকে লিখে তার স্বপ্ন পুরো হয়েছে। এবার আমরা নির্বাচন করব। জনগণের সরকারকে ক্ষমতায় পাঠাব। আমাকে আর এইসব কথাবার্তা

আকৃষ্ট করে না। আমি ভয়ে ভয়ে থাকি রগকাটা বাহিনীও গণতন্ত্রকে দাঁড়িপাল্লায় তুলে নিজস্ব বাটখারা দিয়ে ওজন করে অম্লানবদনে বিক্রি করে চলেছে দেখে, আমি শিউরে উঠি রক্ষীবাহিনী-লালবাহিনী-মুজিববাহিনীও লেজটা কেটে ফেলে গণতন্ত্রের হুক্কা হুয়া রব তুলছে, আমি সিটকে উঠি ধানের শীষ দিয়ে জলপাই পোশাক ঢেকে রেখে জলপাই বাহিনীও গণতন্ত্রের কথা বলছে। কিংবা এসব কিছুই নয়, লাঙল দিয়ে মৃত্তিকাকে চাষযোগ্য করে ছিন্নভিন্ন জলপাই পোশাককে কেউ নতুন করে রোপন করছে মহীরুহ রূপে পল্লবিত করার প্রত্যাশাতে অথবা কোথাও রাত বাহিনী আগের মতোই সারা রাত চষে বেড়াচ্ছে গণতন্ত্রকে। সবগুলো বাহিনী নব নবরূপে মার্চপাস্ট করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নির্বাচনকে স্যালুট দিতে।

এক সকালে উঠে মনে পড়ে এবার আসার পরে মণীষা আর কোনও চিঠি লেখে নি। আর মা'র তো লেখার কথাই নয়। তখনই বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়ি। হাসি পায় এইজন্যে বাড়ি ফিরে মণীষাকে বলতে হবে, সম্বোধীপ্রাপ্তি ঘটে নি আমার। আবারও আমি ফিরে এসেছি ক্লান্ত দেহে উর বেলাতে সুজাতার প্রসাদ নিতে, পায়সান্ন খেতে। কিন্তু সে কথা বলা আর হয় না আমার। বাসস্ট্যান্ডে নেমে হেরিং রোডে ওঠার পরে যদিও আমার প্রাণের মধ্যে প্রচণ্ড উচ্ছাস জেগেছিল। বাড়ি ফেরার আনন্দ এত তীব্রভাবে আর কখনও-ই অনুভব করি নি আমি। এবার কি বাবার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলা চলে না, বাহিনীগুলো ধ্বংস না হলেও বাধ্য হয়েছে আত্মগোপনে যেতে? জোরে জোরে শ্বাস নেই আমি। এখন বসন্ত। রোদ ঝলমল করছে। মামুন গান গাইছে, *কানট্রি রোড টেক মি হোম..* গিটারের নিঃসঙ্গ ধ্বনি সঙ্গতি খুঁজে ফিরছে ওর কণ্ঠের সঙ্গে। ঝলমলে রোদ থেকে একটু ছায়া পেতে ক্রমশঃই তা সরে যাচ্ছে দূরে, বহুদূরে বৃক্ষের ইঙ্গিতে। উড়ন্ত ধূলির গন্ধকেও ভীষণ চেনা লাগে আমার।

যেতে যেতে হালিম নানার সঙ্গে দেখা। আমি ভীষণ উচ্ছসিত হয়ে উঠি এই দেখা হওয়াতে। একটা গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে নানা। পাশে নামিয়ে রেখেছে বাইক আর দু'টো বড় বড় পাতিল। আমাকে দেখে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে নানা, এমনভাবে তাকায় যেন আমি তার ভীষণ অপরিচিত। কিন্তু উচ্ছসিত আমার চোখে তার সেই চাউনি কোনও উদ্বেগ তৈরি করে না। গাছের গুড়িতে বসে নানার সঙ্গে কথা বলা শুরু করি। তারপরই আবার মনের মধ্যে অনুভব করি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়ার তাগিদ। কিন্তু নানা আমাকে নানাভাবে নানা কথা বলে আটকে রাখার চেষ্টা করে চলে। ঘাসের ব্যবসা বাদ দিয়ে এখন নানা ঝিনুকের মাংসের ব্যবসা শুরু করেছে। সারাদিন ঝিনুক কুড়োয় খালেবিলে পুকুরে আর হাঁটা পায়ের নদীর ভেতর। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে বাড়ির মেয়েরা দা দিয়ে ঝিনুক আলাদা করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা

গামলা নিয়ে বসে ঝিনুকের খোসা থেকে মাংস আলাদা করে। ব্যবসা খারাপ নয়। দুএকটা করে হলেও এলাকাতে বেশ কয়েকটা পোলট্রি ফার্ম গড়ে উঠেছে। অনেকে আবার করেছে মাছের খামার। আমার বড় চাচাও না কি পারিবারিক পুকুরটাকে বিরাট মাছের খামার বানিয়ে বসে আছে। সের দরে ঝিনুকের মাংস কিনে নেয় মাছের খামারের মালিকেরা। পোলট্রি খামারের মালিকেরা কেনে ঝিনুকের খোসার গুঁড়া। মাংস ছাড়ানোর পরে সবাই মিলে খোসাগুলোকে গুঁড়া বানিয়ে ফেলে। হালিম নানার ধারণা একদিন না একদিন হঠাৎ করে ঝিনুকের মধ্যে নিশ্চয়ই মুক্তা খুঁজে পাবে। তখন একসঙ্গে বেশ কিছু টাকা কামানো যাবে।

শুনতে বেশ ভাল লাগে আমার। কিন্তু এসব তো পরেও শোনা যাবে। আমি তাই ওঠার চেষ্টা করি। কিন্তু আবারও বাধা দেয় নানা। তার দিকে তাকাতে অস্বস্তি লাগে আমার। কানের সঙ্গে গুঁজে রাখা একটা মুথা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নানা বলে আমার না কি বাড়িতে না যাওয়াই ভালো। এই রোদ ঝলোমলো দিনেও আমার কেমন শীত-শীত করে ওঠে। নানার কাছে সব কথা শুনতে শুনতে এত বিকারহীন হয়ে যাই যে একবার নিজেই নিজের হাতে চিমটি কেটে বুঝতে চেষ্টা করি, আমি আমার কথাই শুনছি না কি অন্য কারও। নানার কাহিনী সংক্ষিপ্ত। মা, বড় চাচা আর তোজাম্মেল ভাই মিলে ঠিক করেছিল মণীষা আর বড় চাচার ছেলের বিয়ে হবে। কিন্তু কে না জানে যৌতুক ছাড়া কোনও বিয়ে হয় না! মাকে যৌতুক দিতে হবে বাবার বাড়িঘরসহ সমস্ত সম্পত্তি। বড় চাচা আর তোজাম্মেল চাচা সেসব ব্যবস্থা করবে আইনসঙ্গতভাবে। আমি শুনি আমি না কি বাবার সন্তানই নই, মণীষাই বাবার বৈধ সন্তান। বাবার মৃত্যুর পরে মুসলিম সম্পত্তি আইন অনুযায়ী তাই সবকিছুর বৈধ মালিক মণীষা আর চাচারা। বাবা মাকে বিয়ে করেছিল মায়ের আগের পক্ষের ছেলেসহ, আমি সেই ছেলে। অতএব আমাকে বহু দয়া দেখানো হয়েছে, এখন নিজের পথ দেখতে হবে। বিয়ের আগের দিন মণীষা আত্মহত্যা করে। তাতে চাচাদের সুবিধাই হয়, পরদিন রাতে মা খুন হয়ে যায়। তবে কোনও খুনের কিংবা অপমৃত্যুর মামলা হয় নি। এতদিন পরে সেটা আর সম্ভবও নয়। গ্রামে এখন এমন কোনও লোক অবশিষ্ট নেই যে আদালতে দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে বলবে, তথাগতই বৈধ সন্তান, সম্পত্তির উত্তরাধিকার। মণীষার আত্মহত্যার সাত দিনের মধ্যেই সমস্ত সম্পত্তির বৈধ মালিক হয়ে গেছে আমার চাচাসকল। পরে তোজাম্মেল ভাইসহ আরও কয়েকজনের মুখ বন্ধ করার জন্যে তাদের কিছু জায়গাজমি দেয়া হয়েছে। লোকে জানে জমিগুলো তোজাম্মেল ভাইরা কিনে নিয়েছে, আসলে সেগুলো ভাগবাটোয়ারা করে পাওয়া জমি। বর্গাদাররা কিছুই বলবে না আর, এর মধ্যেই তারা বিন্যস্ত হয়ে গেছে নতুন মালিকদের ইচ্ছা অনুযায়ী। আর

তোজাম্মেল ভাই বিএনপি করে, ক্ষমতায় আসার পরে এখন তার দাপটই অন্যরকম, কোথাও কোনও কূল পাওয়া যাবে না।

আমার কোনও রাগ হয় না। আমি তো এমনিতেই সব ছেড়ে দিতাম। যতটুকু আঁকড়ে রেখেছিলাম সেতো মণীষাদের জন্যেই। এখন রবিনসন ক্রুশোর দ্বীপ কোথায় খুঁজতে যাব আমি! কোন তুষারে ঘুরে বেড়াবে চুক আর গেক! কোন গ্রামে তিমুর গড়ে তুলবে তার প্রিয় বাহিনী! চোখ আমার ঝাপসা হয়ে আসে। নিজেকে ভীষণ অযোগ্য মনে হয়, একটা পাত্র খোঁজার দিকে মন দিলেই তো আর ঘটত না এইসব। যে উচ্ছ্বাস নিয়ে আমি এসেছিলাম তাকে হত্যা করে আমি আবারও ফিরে চলি। পেছনে ফেলে রেখে আসি আমার বাবার জন্মভূমি, আমার বাবার তিলে তিলে কষ্ট করে গড়ে তোলা মেঠো বাড়ি, জায়গাজমি; ফেলে আসি উরুবেলা, সুজাতা, নৈবেদ্য। অথবা ফেলে আসি না, আমি এগিয়ে যাই আমার বাবারই নিয়তি নিয়ে অন্য কোনওখানে, বিনির্মাণের মহাডাকে। পথচলার ঘোরে আমার কাছে নৈবেদ্যর থালায় পায়সান্ন নিয়ে মণীষা আসে, আদি দ্রাবিড় মেয়ের মতো কানে বুনো ফুল গুঁজে শাড়ির ভাঁজে উদ্যত সম্ভাবনা ঢেকে রেখে উবু হয়ে বসে থালা নামায়, হেসে ওঠে।

আমার সেদিন সত্যি সত্যি সম্বোধী প্রাপ্তি ঘটে।

মারিয়াকে এইব কথা বলি আমি, কখনও জাগরণে, কখনও আধোঘুমে। ক্লান্তিতে ঘুমাই আমি, ঘুমাই অক্লান্তিতেও। এখন আমার চাকরি খুঁজে বেড়াবার সময়, আমার খোঁজা হয় না। একবার টিউশনি শুরু করি। ভাল লাগে না, বাদ দিয়ে দেই। মারিয়া একদিন তার এক বান্ধবীকে ধরে কি এক টিমের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয় সুন্দরবনের দিকে। ভিডিও করবে তারা, বিদেশী টেলিভিশন নেটওয়ার্কের জন্যে। ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজার্ভেশন, খুবই কঠিন কাজ। আমার কাজ স্ক্রিপ্ট বানানো, এডিট করা। কিন্তু টিমের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে, ফাঁকে ফাঁকে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। সারাদিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি করতে হয়, লাভ বলতে এইটুকু যে প্রচণ্ড ব্যস্ততা আমার সবকিছু ভুলিয়ে রাখে, ঘুম হয় খুবই গাঢ়। না বললে পাপ হবে, খাটুনির দামও ভাল। এক মাস পরে ঢাকায় ফিরে এলে মারিয়া শুধু বলে,

সব ভুলে বসে আছো?

আমি হাসি। আমার মাথার চুল বড় বড় হয়ে গেছে, গালে ব্লেড পড়ে না, হালকা নীল জিন্‌সে ময়লা দাগ জমেছে। সেসব কিছুই আর মারিয়ার চোখে পড়ছে না। আমারও চোখ এড়িয়ে যায় ঢাকার রাজপথ আবারও গরম হয়ে উঠছে। এই একমাস আমি যেসব জীবন দেখেছি তার সঙ্গে এখানকার কোনও কিছুর সামঞ্জস্য নেই। পশুপাখির কথা বাদই দিলাম। বাওয়ালীদের জীবনের আনন্দ-উল্লাস, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিনের আহার জোগাড় করবার সংগ্রাম এই চাকরিজীবী নিরাপত্তায় আকীর্ণ মানুষেরা কোনওদিনও টের পাবে না। তারা সকালবেলা উঠে বাথরুমে যেয়ে বেরিয়ে আসবে ধোপদুরস্ত মানুষ হয়ে, কেননা এটাই তাদের কাছে জীবনযাপনের প্রধান মানদণ্ড। তারা সঙ্গম করতে ভুলে যাবে পরদিনের দাপ্তরিক কাজের কথা মনে করে, তাদের স্ত্রীরাও তা মনে করিয়ে দেবে না চুলে মুরগির ডিমের কুসুম মুখে লেবুর রস আর স্তনে মুসুরির ডাল বেটে লাগিয়ে সারা রাত রূপচর্চা করে সকালে উঠে ঘরের বাইরের পুরুষদের প্রশংসা শুনতে যেতে হবে জন্যে।

আমার এসব কথা শুনে মারিয়া কেবলই হাসে। তার হাতে এখন অফুরন্ত সময়। টিভি নেটওয়ার্কের কাজটা শেষ হওয়ার পরে আমিও বেকার। আবারও একটু ব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেন্ট মার্টিন্‌স্ দ্বীপের ওপর একটা ডকুমেন্টারি করতে ওরা আবারও এলে। ততদিন ঢাকার অলিগলি চেনা যেতে পারে। হরতাল চলে অবিরাম, আমরা অলিগলি দেখি অবিরাম। কখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিটিং শুনি। রগকাটা বাহিনী এখন আরও সংঘবদ্ধ, তাছাড়াও না কি সারা দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ফতোয়াবাজ বাহিনী। জলপাই পোশাক লুকিয়ে রাখা মানুষেরা কিছু বলে না। মাইলের পর মাইল সারি সারি তুঁত গাছ কেটে ফেলে ফতোয়াবাজ বাহিনী। কে একজন আবার সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করে শুকানোর পরে বিক্রি করার আশায়। গাছের সবুজ পাতা ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ে, চোখ বোজে আকাশ আর মাটির সঙ্গে আড়ি দিয়ে। মারিয়ার বন্ধু শাহেদা সিলেট থেকে বোচকাগাট্টি বেঁধে নিয়ে ফিরে আসে ঢাকাতে চাকরি আর করবে না জন্যে। যে স্কুলে ও চাকরি নিয়েছিল সেটা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, এতদিনে বোধহয় সব ছাই বাতাসে উড়েও গেছে। বোরখা পরে চলাফেরা করত না জন্যে শাহেদাকে না কি একদিন রাস্তায় লোকজন ধরে রোদের মধ্যে চারঘন্টা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। লোকগুলো এত অপদার্থ যে মানুষের ডায়েরি না জানিয়ে পড়া মহাঅন্যায় সেটা একটুও বোঝে না। চোরের মতো চুপি চুপি ডায়েরি পড়ে শাহেদার নানা একটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এটা আবিষ্কার করে তারা খুবই খুশি। কৃতকর্মের জন্যে একটু অনুতাপও প্রকাশ করেছে, তবে অন্যভাবে; বলেছে, আপনি যে কালাম মওলানার নাতনি সেটা আগে বলবেন না? ডায়েরি পড়ার জন্যে মাফ চাওয়ার বিন্দুমাত্র তাগিদও অনুভব করে নি তারা।

শাহেদা আমাকে আর মারিয়াকে রুদ্ধশ্বাসে তার চাকরি জীবনে ঘটে যাওয়া অলৌকিক সব গল্প শোনায়,– অলৌকিক কেননা এরকম ঘটনা যে বাস্তবে ঘটতে পারে তা শাহেদা ধারণাই করে নি কোনও সময়। গল্প উপন্যাসে পড়েছে, পড়ে ভেবেছে কাল্পনিক কিছু কিংবা অনেক আগের ব্যাপার। ছাত্রী জীবনে ওয়েস্টার্ন শাহেদার ভীষণ প্রিয় ছিল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত তার ওয়েস্টার্নের টানটান বর্ণনা পড়তে গিয়ে, কতদিন সে শুয়ে শুয়ে বসে বসে অবসরে অনুভব করেছে টেক্সাসের প্রান্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলার, ট্র্যাক খুঁজে বের করার উত্তেজনা। কিন্তু এই বাংলাদেশেই অজপাড়াগাঁয়ে যেয়ে যে তাকে ওর চেয়েও বেশি উত্তেজনার মধ্যে পড়তে হবে তা বেচারি স্বপ্নেও ভাবে নি। এইভাবে স্কুলগুলো পুড়ে যেতে থাকে, স্কুলে যে মায়াবতী মুখগুলো শিশুদের কলহাস্যে নিজেদের নিভৃত বেদনা মুছে যেতে দেখে সেই মুখগুলো ক্রমশঃ আতংকিত হয়ে উঠতে থাকে। জীবনের নিজস্ব আনন্দর দুয়ার খুলে উঁকি দেয়া সন্তানের মুখ দেখে কম্পিত ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে বসে থাকা লোকগুলো সার বেধে দাঁড়িয়ে পড়ে দোররা মারার হুকুম নিয়ে। ঢাকায় বসে থেকেও আমরা তার দাপটে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকি। কিন্তু টিভির ভেতর নির্বিবাদে হরেক রকম সাবান মাখতে থাকে বিজ্ঞাপনের সুন্দরীরা, নির্বিকার ভঙ্গীতে বিউটি পার্লার থেকে চুল বিন্যাস করে তার ওপরে আরব দেশের গেলাব চাপিয়ে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে ভাষণ দিয়ে চলে এক ফর্সা গোলগাল রমণী। ভাষণ দিতে দিতে একটুও ক্লান্ত হয় না, নেহাৎ দায়ে পড়লে একটু ফালুদা পান করে নেয়, বাংলাদেশের এই পানীয়টাই কেবল তার কাছে পাকিস্তানী সেজ্জানটেজানের-এর চেয়ে একটু বেশি ভাল লাগে। রগকাটা বাহিনী তাতে কিছু মনে করে না। তারা একমনে তাদের কাজ করে চলে, তাদের কাছে আর মনে হয় না ইসলাম বিপন্ন হয়েছে, যেমন মনে হতো একাত্তরে কিংবা তারও পরে বেশ কিছুদিন।

মনে হয় আর কোনও দিনই এই অন্ধকার সরে যাবে না। রামদা উঁচিয়ে নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর বলে ভার্সিটিতে কলেজে দাপিয়ে বেড়াবে রগকাটা বাহিনী। গরমের দিনেও তাদের কেউ কেউ গায়ে চাদর জড়িয়ে রাখবে। ছুরি দিয়ে হাতের কব্জি কিংবা পায়ের রগ কাটতে, রামদা দিয়ে জবাই করে ফেলতে খুব বেশি পছন্দ করলেও নেহাত দায়ে পড়ে কখনও কখনও চাদর সরিয়ে আধুনিক মারণাস্ত্র বের করবে তারা, গুলি করতে থাকবে একনাগাড়ে। কিংবা রকেট লাঞ্চার দিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রকম্পিত করবে আকাশ, ধ্বসিয়ে দেবে ছাত্রনিবাস। পেপারে সেসব খবর পড়তে পড়তে আমি আনমনা হয়ে পড়ব। আবারও ডেটলের গন্ধ এসে নাকে লাগবে। আইয়ুব শূন্য চোখে বিবরণ দিতে থাকবে রাতকাটা বাহিনীর আচমকা আক্রমণের। ওরা যে যে-কোনও সময়ে এসে হামলা করতে পারে সেকথা তো সবারই জানা ছিল। রোজার ছুটি তখন। হলেও তেমন ছাত্র নেই। আর প্রভোস্টটাও একেবারে লেথর, এবং ভীতুর ডিম। হাউজ টিউটররাও হাফ ছেড়ে বেঁচেছে রোজা আসায়। অনেক দিন বাড়ি যাওয়া

হয় না, এবার যেতেই হবে এই দোহাই দিয়ে চলে গেছে তারা। গোটা হলকে দিনের বেলায়ও মনে হয় নিঝুম পুরী। কেবল আইয়ুব আর আরও দশবারো জন বাড়ি যায় নি ঈদের পরেই পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ দেয়ায়। তাছাড়াও আছে কিছু ছাত্র, কোনও পার্টি করে না, স্রেফ সারাদিন প্রেমিকাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হওয়াতে রয়ে গেছে তারা সবাই। এদের সংখ্যা জানা নেই তাদের, আটটার পরেই ফিরে আসে তারা, কেননা ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়াতে দারোয়ানকে আইয়ুবরা বেশ কড়া ভাবে বলে দিয়েছিল ন'টার আগেই গেট বন্ধ করে দিতে। সারা রাত পালা করে পাহারা দিত ওরা যাতে আচমকা হামলা করতে না পারে রগকাটা বাহিনীর লোকেরা। এই হলটা দখল করার খায়েস রগকাটা বাহিনী পুষে রেখেছে বহুদিন হল। আর সেজন্যে হলটার কাছে বিনোদপুর আর বুধপাড়া গাঁয়ে ঘাটি গেড়েছে পাকাপাকিভাবে। ভার্সিটির কয়েকজন শিক্ষক সেখানে জায়গা কিনেছে, তার ওপরে ছাত্রদের জন্যে মেস বানানো হয়েছে, তবে সেই মেসে কোনও সাধারণ ছাত্র থাকে না, থাকে রগকাটা বাহিনীতে রিক্রুট করা বাছা বাছা ছাত্ররা। কেউ কেউ লজিং নিয়েছে আশেপাশের লোকজনের বাড়ি, বিনা পয়সায় ছাত্র পড়ায়, ধর্মকর্মের কথা বলে, বাড়ির মালিকরা মনে করে ছেলেগুলো তো ভালই, এদের ওপর ভার্সিটির আর সব ছাত্ররা এত ক্ষ্যাপা কেন। অনেকে বিয়ে করে আরও পাকাপোক্ত ঘাটি গেড়েছে। কোনও মারামারি হলেই মেস থেকে মধ্যযুগের, আধুনিক যুগের মারণাস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামগুলোয় পৌঁছানোর আগে টিচার্স কোয়ার্টার। সেখানেও তাদের আস্তানা আছে, রগকাটা বাহিনীর শিক্ষকেরা রগকাটা বাহিনীর অস্ত্র জমা রাখে, দরকার হলে বের করে দেয়, আশ্রয় দেয় ছাত্ররা পিছু ধাওয়া করলে। আর শিক্ষকদের তো সাতখুন মাফ, তাদের বাড়িতে অস্ত্রের জন্যে তল্লাশি চালাবে সাধ্য কার! গোত্র-গোষ্ঠী সব ভুলে তারা তখন বন্দনা জুড়বে, জগত জুড়িয়া আছে এক জাতি সে জাতির নাম শিক্ষক জাতি। সেই জাতির প্রাইভেসি নষ্ট করা হচ্ছে, সুনাম নষ্ট করা হচ্ছে সুগভীর ষড়যন্ত্র করে।

সারা রাত তাই পাহারা দেয় আইয়ুবেরা, ছেলে ঘুমালে পাড়া জুড়ালেই রগকাটা বাহিনী আসার ভয়ে। সেদিনও তারা রাতভর পাহারা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ভোর হওয়ার একটু আগে। আগের দিন ঈদ হয়ে গেছে, কাল-পরশুর মধ্যে বাড়ি থেকে দলে দলে ফিরে আসবে সাধারণ ছেলেরা, তখন রগকাটা বাহিনীর সাধ্য কি হলে এসে হামলা করে! ভোর হওয়ার একটু আগে, আকাশ ফর্সা হয়-হয় সময়ে কয়েকজন ছেলে এসে রিকশা থেকে নামে, হলের দারোয়ান দেখে একটুও দাড়ি নেই তাদের, জিনসের প্যান্ট পড়েছে, শুধু তাই না কোনে বালা আছে, গেঞ্জির ওপর এ্যামবুশ করা কোবি কেটস্-এর দরজার আড়াল থেকে উঁকি দেয়া লাজুক-লাজুক হাসিমাখা মুখ। দারোয়ানকে তারা বলে, একটু আগে যে রেলগাড়ি গেল, এখান থেকেও তো আওয়াজ শুনতে পারার কথা আপনার, সেই গাড়িতে এসেছি আমরা। এই হলেই থাকি, পরীক্ষা

সামনে, তাই ঈদ করেই রওনা হয়েছি। দারোয়ান আর পরিচয়পত্র দেখতে চায় না, তাছাড়া ফোবি কেটস্-এর লাজুক-লাজুক মুখওয়ালা গেঞ্জি পরে আছে, হাতের ম্যাগাজিনের মলাটে দেখা যাচ্ছে কোনও সরস মেয়ের অর্ধেক বুক, এই ছেলেরা কি আর রগকাটা বাহিনীর হতে পারে! গেট খুলে দেয় দারোয়ান। তাকে খুব সহজেই কুপোকাত করে মুখে কাপড় গুঁজে হাতপা বেধে গেস্টরুমে রেখে অভিযান শুরু করে রগকাটা বাহিনী। সতর্ক করার জন্যে ঘন্টি বাজানোরও সুযোগ পায় না দারোয়ান। ব্যাগের মধ্যে থেকে তারা বের করে শ' শ' তালা। গেট থেকে শুরু করে প্রতিটি রুমে নিজস্ব তালা আটকায় তারা। অভিযানের প্রথম পর্ব সফল হয়েছে এই সংকেত পেয়ে এগিয়ে আসে পেছনের বাহিনী। তারপর শুরু হয় মূল অভিযান, নৃশংসতার যাবতীয় প্রকরণ পুনরায় পরীক্ষানিরীক্ষা করবার অভিযান। একেকটি করে তালা ভাঙা হয়, পরীক্ষা করে দেখা হয় সেই রুমে কে থাকে, সে এখন রুমে আছে কি না, তাকে কোনও পার্টির মিছিলে কিংবা কোনও নাটক-গানের অনুষ্ঠানে দেখা গেছে কি না। খুঁজে খুঁজে হিসাবনিকাশ করা হয় সাধারণ ছাত্র হলেও তার টেবিলে কোন ধরণের বই আছে পাঠ্যবই ছাড়া এবং সে অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয় ছাত্রটি কোন মানসিকতার, কোন ধরণের শাস্তি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। আইয়ুবরা যে কাউকে একটু খবর পাঠাবে, ঢিল ছুঁড়ে কিংবা ছাদে উঠে চিৎকার করে বাইরের লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এর কোনওটাই হয়ে ওঠে না। কেউ কেউ জানালা খুলে চিৎকার করতে থাকে, কিন্তু কে শুনবে সেই চিৎকার? তালাবদ্ধ ঘরে বসে বসে আইয়ুবেরা শোনে অন্য কোনও রুমে ইন্টারোগেশন করছে রগকাটা বাহিনী, আর্তচিৎকার ভেসে আসছে। হয়তো কারও রক্ত ফিনকি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে, নিস্তেজ হয়ে আসছে শরীর। আর রগকাটা বাহিনীর ছেলেগুলো বলছে, কম্যুনিস্ট কাটলে নেকি বেশি।

আমি আর শোনার সাহস হারিয়ে ফেলি। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে রিকশায় ঘুরতে থাকি। রিকশা জ্যামে আটকে পড়ে ওসমানী উদ্যানের কাছে। ঢাকা এখন জ্যামের শহর, এই জট কাটতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। এক-দুই ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা হতে না হতেই রিকশাওয়ালারা প্যাডেলে ঘুরায় ব্রেক না ধরেই। এক রিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগে আরেক রিকশার। তারপর শুরু হয় তাদের ভাষাচর্চা। তাদের সে অনুশীলনের তোড়ে কান খোলা রাখাই কষ্টকর হয়ে ওঠে। আমি তাই উদ্যানের দিকে তাকাই। এবং যা দেখি তাতে চমকে উঠি। তিরিশ-উনতিরিশ বছরের এক ছেলেকে ধাওয়া করতে করতে উদ্যানে নিয়ে আসে একদল লোক। তাদের হাতেও চকচকে রামদা। শেষ মুহূর্তে পড়ে যায় ছেলেটা পেছন থেকে একটা লোক তার পায়ে পা বাধিয়ে দিলে। তারপর জান্তব উল্লাসে ফেটে পড়ে লোকগুলো। 'দোকান বহাইছস, চান্দা দিবি না? আবে হালায় মগের মুল্লুক পাইছ?' বলতে বলতে একজন ছেলেটার বুকে চেপে বসে,

গরুকে যেমন কোরবানি দেয়ার আগে হাতপা চেপে ধরে একজন মাথাটাকে টেনে ধরে গলায় যুতসই পোঁচ লাগানোর জন্যে ঠিক তেমনি করে আর সবাই চেপে ধরে ছেলেটার হাতপামাথাগলা। আর আরেকজন দাঁড়িয়ে থেকে নির্বিকার মুখে রামদা দিয়ে কোপ মারে গলায়। রক্ত ছিটকে ওঠে, মানুষের দল দূরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখে, মানুষের দল কোনও কথা বলে না, আমি যুবকের মুণ্ডু আর ধড় আলাদা হয়ে যেতে দেখি, যুবককে আরও একটা গলাকাটা লাশ হয়ে যেতে দেখি, মানুষ-তাড়ুয়া হয়ে যেতে দেখি। মানুষের দল সেই মানুষ-তাড়ুয়া দেখে ধীরে ধীরে দূরে পালিয়ে যেতে থাকে, কাছেই একদল *ঠোলা*, তারাও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কর্মব্যস্ত শহরের ব্যস্ততা একটুও কমে না, সুন্দরী মেয়েগুলো হাসতে হাসতে কাপড় বাছে কাপড় কেনে কাপড় পরে, গয়না বাছে গয়না কেনে গয়না পরে, পার্সোনালিটিওয়ালা ছেলেগুলো ক্লিনড সেভ হয়ে টাইনট বাধে, সাফারি কিংবা কমপ্লিট ড্রেস পরে অফিস করে, পার্টিতে যায়, পাত্রীর শরীর যাচাই করে চাইনিজের আলোআধারীতে; সুন্দরী মেয়েগুলো ব্যবসার চুক্তি কিংবা চাকরির নিয়োগ ও তদবিরের জন্যে সচিবালয়ে ঢোকে, পার্সোনালিটিসম্পন্ন ছেলেগুলো ডিনার খেতে খেতে জানিয়ে দেয় তার আত্মীয়স্বজন কে কে আছে, সামরিক বাহিনী আর সচিবালয়ে কে কে কোন পদে চাকরি করে, কোন ব্যাংকের কোন একাউন্টে কত টাকার কমিশন জমা দেয়া হবে আর লাল ফিতায় আটকে পরা কোন ফাইল ওপেন হবে। ফেরিওয়ালা ফেরি করে, হকার কাপড় দেখায়, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আনারস আর পেপে খেয়ে শান্ত হয় ক্লান্ত কর্মব্যস্ত নিম্নবিত্ত মানুষ, কিন্তু মানুষ-তাড়ুয়া দেখে পেছাতে থাকে সবাই, পেছাতে পেছাতে চলে যায় দৃশ্যের অন্তরালে। মানুষ-তাড়ুয়া বাড়ে, কমতে থাকে মানুষ, মানুষ-তাড়ুয়া বানানোর কারিগর মানুষ বাড়ে, কমতে থাকে মানুয। মানুষ-তাড়ুয়া কিছু বলে না, মানুষ কিছু বলে না; মানুষ-তাড়ুয়া বানানোর এক কারিগর আরেক কারিগরকে শাসায়, আমি তোকে একটা দিনও শান্তিতে থাকতে দেব না; জবাবে সে কারিগরও রুষে উঠে বলে, কেয়ামত হয়ে যাবে, তবু তুই আমার জায়গায় বসতে পারবি না। শুনে সে কারিগরের মেজাজ তেঁতে ওঠে, সে যেয়ে গুজুর গুজুর শুরু করে রগকাটা বাহিনীর সঙ্গে, চল, আমরা মিলে মিশে ওইটাকে কাতেল করি। তারপর তারা কাতেল করার পরিকল্পনা করতে থাকে।

মারিয়ার দায়িত্ব আবারও বাড়ে। সে আমাকে আবারও সান্ত্বনা দিতে থাকে, চিন্তা কর না তুমি। এইবার কিছু একটা হবে। দেখ, আবারও নতুন করে মুক্তিবাহিনী তৈরি হচ্ছে। মানুষ আবারও জেগে উঠছে, কেননা মা তাদের ডাক দিয়েছে, মায়ের এখন কেইবা আছে, তাঁর সন্তান হারিয়ে গেছে এই রগকাটা বাহিনীরই হাতে দূর অতীতে, আজ তার হারাবারও কিছু নেই, আজ সে তো যে কাউকেই ডাকতে পারে ছেলের নামে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি হাজার হাজার ছেলে মামুন হয়ে গেছে, হাজার হাজার ছেলে যেন গান গাইছে, *মা গো ভাবনা কেন...*। মারিয়ার মুখে সলজ্জ হাসি

ফুটে ওঠে, বলে আমার খুব মা হতে ইচ্ছা করছে। বলে সে আমার বুকে মুখ রেখে পিঠে দুষ্টুমি করে কিল দিতে থাকে। আমাদের চোখে স্বপ্ন ফিরে আসতে থাকে; পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে মানুষ খুন হয়ে যায়, পাটের দাম না পেয়ে কেউ তাতে আগুন ধরায়, মেয়ে জন্ম নেয়ার পরে কাঁদতে কাঁদতে মা তাকে লবণ খাইয়ে মেরে ফেলে, ছাত্রাবাসে ছাত্র নির্যাতনের পরে লাশ গুম করার জন্যে টেনে হিঁচড়ে ছাঁদে নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস বের হওয়ার আগেই ঠেলে ঢোকানো হয় পানির ট্যাংকির মধ্যে, সেগুন কাঠের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে একসঙ্গে মাতামাতি করতে থাকে সংসদ সদস্যরা, ফাইল চাপড়ে চেয়ার ভেঙে বেরিয়ে এসে পদত্যাগপত্র লিখে জমা দেয়ার পরে ব্যাকডেটে শুল্কমুক্ত গাড়ির জন্যে আবেদন করে তারা, দিনেদুপুরে তিনতিনটা খুন করে হাসতে হাসতে চলে যায় একজন সবার সামনে দিয়ে, কেউ কিছু বলে না; আমাদের স্বপ্ন তবু ফিরে আসতে আসতে থাকে, একশ আটটা নীলপদ্ম ফুটতে থাকে, কৃষকেরা সারি বেঁধে সড়কে এসে দাঁড়ায় কিছুতেই সীমান্তের ওপারে ট্রাকে করে সার পাচার করতে দেবে না বলে, কৃষকেরা গুলি বুকে করে লুটিয়ে পড়ে কিন্তু তাকে মানুষ-তাড়ুয়া বানানো যায় না, তার বদলে সে ঘুম-জাগানিয়া মানুষ হয়ে ওঠে, পুলিশের ভ্যান থেকে ইয়াসমিনের লাশ গড়িয়ে পড়তে পড়তে, শালিস শেষে বাড়ি ফিরে এসে নূরজাহান অপমানে আত্মহত্যা করতে করতে ঘুম-জাগানিয়া মানুষ হয়ে ওঠে। মানুষ-তাড়ুয়ারা আবার মানুষ হয়ে ওঠে, মানুষেরা আবার মানুষ হয়ে ওঠে,– কেননা আমি আর মারিয়া স্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর হাত ধরে স্বপ্ন দেখতে দেখতে বেঁচে থাকি।

মারিয়া বলে, আবারও সাঁতার কাটব আমি। চ্যানেল বিজয় করতে যাব। আমি ওর চুলে হাত বুলাই, চোখের অতলান্তে ময়ূরপঙ্খী ভাসাই। অবাক বিস্ময়ে দেখি এক মৎস্যকন্যা জলের অতলে ডুবসাঁতার দিয়ে ভেসে আসছে, আকাশের দিকে জলের ফেনা ছড়িয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ছেড়ে হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। প্রাচীন জলাভূমির মধ্যে ছায়া ফেলেছে হিজল-তমাল; ছায়ায় ছায়ায় বেড়ে উঠেছে বনলতা, বুনো গোলাপ, বুনো মুরতা, বুনো শন, নলখাগড়া এবং সবুজ ঘাস। তার মধ্যে মারিয়া ভেসে বেড়ায় মৎস্য কন্যা হয়ে, মুখটুকু তুলে মাঝে মাঝে কথা বলে গাছ-লতা-গুল্মের সঙ্গে। পানি একটু কমে এলে তার সঙ্গী হয় জলবাদাম, উকল, পারুয়ারা; পানি একটু বাড়লে সে পাশ কাটায় জলজ ঘাস, নীলপদ্ম, জললতাদের। জলের সঙ্গে সে একা একা কথা বলে চলে জলের মতো ঘুরে ঘুরে। বলতে বলতে জলকন্যা উঠে আসে শুন্য ডাঙায় রাজপুত্রের মোহে। তার চুল থেকে জল গড়িয়ে পড়ে আমার বুকে, ভিজিয়ে দেয় আমাকে। রূপকথার জলপরী দেখি আমি। জলপরীর গা থেকে জল গড়িয়ে পড়ে, উন্নত স্তনের মধ্যে জলের ফেনা লেগে থাকে, উরু বেয়ে জলকণা গড়াতে থাকে মুক্তার দানা হয়ে। দেখ, তোমার হয়তো জানা নেই ভাল করে, সমুদ্র কন্যা বল মৎস্যকন্যা বল জলকন্যা বল তারা কিন্তু সত্যি সত্যি আছে। কলম্বাস হয়তো তাদের দেখে মুগ্ধ

হন নি, তাতে কিছু যায় আসে না। অডিসিয়াস তো তাদের মোহনীয় সঙ্গীত ঠিকই শুনেছিলেন।

জলকন্যা আমাকে বলে,

এই দেখ মরাল গ্রীবা, এই দেখ অরুণাচল, এই দেখ রক্তিম কাঠের চিতা, দেখ দীঘল পদক্ষেপ; তুমি কোন অমৃত চাও আমার কাছে?

আমি নিজের দিকে তাকাই। কি চাওয়ার আছে আমার? অমরতা, সৃষ্টির সুখ-উল্লাস? অথৈ সমুদ্রের বুকে হাতের তালুবন্দি ছোট কম্পাস? কিংবা সেসব কিছুই না : যে মিছিল রওনা হয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে শুধু তার সফলতা ? মনে হতেই হাসি আমি। এই জেগে ওঠা মানুষেরা কি এটুকু বোঝে না সোহরাওয়ার্দীর উদ্যান নয়, তাদের হেঁটে যেতে হবে গণভবন আর বঙ্গভবনের মধ্যে? তারা কি এটুকু বোঝে না যারা বলছে তোমাদের যাওয়ার দরকার নেই, আমরা গেলেই তো তোমাদের যাওয়া হবে, আমাদের পাঠানোর ব্যবস্থা কর,– তারা ওখানে যাবার পরে সব ভুলে যাবে, যেমন সব ভুলে বসেছিল এর আগে? তারা বলে, চিন্তা কর না, এই যে আমরা রগকাটা বাহিনীর সঙ্গে কথা বলছি, পোশাক খুলে রাখা জলপাই বাহিনীর সঙ্গে কথা বলছি এর সবই রাজনৈতিক কৌশল আর কি। আমরা তাদের বলতে পারি না একই যুক্তি দিয়ে তো চৈনিকদেরও ক্ষমা করে দিতে হয় তাহলে। কেননা তারাও একদা জলপাই বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এগারোশ' মাইল দূরের দেশটার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কৌশলগত কারণে। কিন্তু এসবই হেঁদো যুক্তি। অমরতার সঙ্গে এর যোগাযোগ নেই এতটুকু। চৈনিকেরা এখন পচা শামুক হয়ে গেছে, কিন্তু রুশিরাও যে এক-একটা সোনার কলা হয়ে গেছে, সে কলা এখন ব্যবহৃত হচ্ছে বুর্জোয়াদের পায়ু মৈথুনে সে কথা আর কেউ বলে না। আমি ক্লান্ত কণ্ঠে কেবলই বলি,

কিছুই চাই না আমি। না অমৃত, না সৃষ্টির অধিকার। দেখ তুমি, লোকগাথা যে রচনা করে গেছে সে তার সৃষ্টির অধিকার দাবি করে নি, অমরতা দাবি করে নি। অন্ধকার গুহার গায়ে যে মৃত্তিকায় পিঠ ঠেকিয়ে মৃদু চকমকি পাথরের আলোয় এঁকে গেছে নিজের সময় সেও তা দাবি করে নি। পিতৃত্বের দাবিই বা এখনও কে করতে পারে জোরেশোরে? যে প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিল তার নাম কি ছিল কখনও-ই জানতে পারব না আমরা। কে কি করল তা কি মনে রাখার আসলেই কোনও প্রয়োজন আছে পৃথিবীতে? তারচেয়ে বড় প্রয়োজন কি নয়, যে জ্ঞান রেখে গেল পূর্বসূরীরা তারই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা? জ্ঞানবাহী প্রাণীর প্রজনন যাত্রা অব্যাহত রাখা?

উত্তর পাই না। তাকিয়ে দেখি মারিয়া ঘুমিয়ে গেছে আমার বুকে। একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে এক যুবতী ঘুরে বেড়াচ্ছে মাতৃত্বের স্বীকৃতির দাবিতে। সে বলে, ছেলেটা আমাকে ফুসলিয়ে অন্তঃসত্তা করে কেটে পড়েছে। দরবারের মধ্যে মাটিতে

পুতে দোররা মেরে তার পাপ স্খলনের উদ্যোগ নেয়া হয়। আর্তচিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির চুল দুলতে থাকে। ফতোয়া দেয়া বৃদ্ধরা নিজেদের বিগত যৌবনের কথা চিন্তা করে চলে যৌবনবতীর দিকে তাকিয়ে, চিন্তা করে চলে এমনি করে যৌবনকে স্থবির করে দিয়ে প্রতিশোধ নেবে তারা। আবারও কারা মিছিল করতে থাকে, সংসদ থেকে বেরিয়ে এসে হোস্টেলে বসে বসে টেলিফোন করে বিল বাড়াতে থাকে। হাসতে হাসতে বলে, আমরা আর ফিরে যাব না। শুনে একজন ক্ষেপে ওঠে, এতদিন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যস্ত থাকায় এসব দিক খেয়াল করি নাই। এখন দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইছে দেখে আপনারা সব পণ্ড করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। আপনাদের এই চক্রান্ত আমরা সহ্য করব না। ম্যাডাম হুকুম দিলেই আমরা আপনাদের স্তব্ধ করে দেব। আরেকজন মনের দুঃখে বলে, আপনারা শুধু আমার মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতিই দেখেন আর কারওটা কিছুই দেখেন না। তার গলা সাতসকালে ডাঙ্গুলি খেলা থেকে ঘাড় ধরে তুলে আনা অভিমানী কিশোরের মতো শোনায়। একজন শাদা চামড়ার মানুষ দেখি গলা বাড়িয়ে বলছে, ও খুকি তোমরা ঝগড়া করছ কেন। এক বুড়িখুকি ঘাড় বাঁকায়, নালিশ করে। আরেক বুড়িখুকিও ঠোঁট ফুলায়, নালিশ করে। এইভাবে বুড়িখুকুদ্বয় কুতকুতি খেলতে থাকে তাদের ইচ্ছামাফিক। আমরা দর্শক হয়ে কখনও সে খেলা দেখি, কখনও স্যাটেলাইটে নারীদের নৃত্য দেখি, হাঁটতে হাঁটতে কখনওবা অফিসে গিয়ে গল্প করি।

তারপর রাস্তার [illegible]ড়ের সে ফোয়ারাটায় দিনের বেলায় রাতভর রঙচঙ মেখে শরীরবিকানো মেয়েগুলো গোসল করে, গোসল শব্দটাই তাতে নাপাক হয়ে যায় জন্যে তখন সে কাজকে [illegible] বলতে একটুও দ্বিধা করেন না এক পরহেজগার মওলানা, সেই ফোয়ারা থেকে একটু সামনে কড়ুই গাছের নিচে বিশাল এক স্টেজ বানানো হয়। মেয়েগুলোর ভীষণ অসুবিধা হয় কেননা তারা আর রাস্তায় দাঁড়াতে পারে না সন্ধ্যার পর থেকে খদ্দের ডাকতে। স্টেজের ওপরে, সামনে, পেছনে, চারদিকে জমা হয় বিরল প্রজাতির পেঙ্গুইন পাখি। আমরা প্রতিদিন পেঙ্গুইনদের জীবনযাত্রা দেখতে থাকি। আমরা দেখি হিংস্র ঈগলও পেঙ্গুইনদের আর কিছু করতে পারে না। এক ঈগলশিশু বলে, মা আমাকে কোনও কাজ দাও না। বসে বসে এইভাবে সরকারি বাড়িগাড়ি ব্যবহার করতে ভাল লাগে না। ঈগলমাতা তখন বিরাট ইফতারি পার্টির আয়োজন করে। ইফতার পার্টিতে খরচ হয় ছয় লাখ বাইশ হাজার আটশ আটত্রিশ টাকা। ঈগল মাতা হাসে, তাতে কি। কারা যেন শ্লোগান দিতেই থাকে, *খালেদা জিয়ার বুকের বল, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল..*। ঈগলমাতা লাল শাড়ি পরে, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, গালে লালচে আভা। কেবল কপালটাতে লাল টিপ দেয়াই বাকি থাকে কেউ আবার হিন্দু-হিন্দু ভাবতে পারে বলে। তারপর ঈগলমাতা এগারোশ' মাইল দূর থেকে আসা জিন্নাহ টুপি পরা অতিথির দিকে [illegible] লাজুক হাসি দিতে দিতে বলে, এই যে এত হাঙ্গামা

দেখছেন, সব আমার ডানা ভাঙার অপচেষ্টা। আমি ভয় পাই না। আমার বুকে বল আছে, এদের যে-কোনও মুহূর্তে প্রতিহত করতে পারি।

কিন্তু ঈগলমাতার ডানা সত্যি সত্যি ভেঙে পড়ে। সে ভাঙা ডানা হাতে নিয়ে নতুন কোনও বাহিনী উল্লাস করে। আমরা সে বাহিনীর নাম জানি না। পেঙ্গুইনেরা ব্যস্তসমেত ঈগলদের ডানা কুড়াতে থাকে, জুড়ে নেয় নিজেদের অপভ্রংশ ডানার সঙ্গে অদ্ভুত নিপুনতায়। সুকুমার রায় কোথা থেকে গলা বাড়িয়ে মারিয়াকে বলে, এরা হল পেঙ্গুইগল। সেকথা বলে মারিয়া খিল খিল করে হাসতে হাসতে থাকে, আমিও হাসি হো হো করে। বলি, আচ্ছা ওই যে বলেছিলে মুক্তিবাহিনী হচ্ছে নতুন করে, ওরা কোথায়? মারিয়ার মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। আমি আবারও বলি, আচ্ছা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে কি এই যে কিছু মানুষ আগে থেকেই ঠিক করে রাখে যে কেউ কেউ তো যুদ্ধের বিরোধিতা করবেই, আর আমরা যুদ্ধ শেষে বিচার করব ওদের, না কি অন্য কিছু? মানে ধর অন্ন-বস্ত্রের নিশ্চয়তা? মারিয়ার মুখ ভারি হয়ে যায়, চোখ টলটল করে ওঠে। আমি আর কিছু বলবার সাহস খুঁজে পাই না। কান্না লুকিয়ে মারিয়া হাসতে হাসতে রওনা হয় বিমান বন্দরের দিকে। ইংল্যান্ড যাবে সে চ্যানেল জয় করতে। আমি তাকে বিদায় দিয়ে বাইরে একা একা দাঁড়িয়ে থাকি। আর ভাবি জলকন্যাও কেমন সুন্দর আকাশে উড়তে পারে। কিন্তু সমুদ্র জলকন্যাকে ডাক দিতে থাকে। জলকন্যা অস্থির হয়ে ওঠে। এখন কেমন করে যাবে সে সমুদ্দুরের মাঝে? ও সমুদ্দুর ডেকো না তুমি। সমুদ্দুর তবু ডেকে চলে। আর বিমানের ডানা কাত হতে থাকে, কাত হতে হতে সে ডুব দেয় সমুদ্রের মধ্যে জলকন্যাকে আপন ভুবনে পৌঁছে দিতে। আমি ঘন ঘন সিগারেট টানি, বার বার পেপারে নিউজটা পড়তে থাকি, একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার...কতবার মনে থাকে না। মনে হয় পেপারে ভুল লিখেছে, হয়তো মারিয়ার নামটা নিখোঁজ যাত্রীদের তালিকায়, ডুবে যাওয়া যাত্রীদের তালিকায় ভুল করে ছাপা হয়েছে, হয়তো মারিয়া সাঁতার কাটতে কাটতে গিয়ে উঠেছে কোনও নিঃসঙ্গ দ্বীপে, রবিনসন ক্রুশোর মতো হাড়ভাঙা খাটনি করে গড়ে তুলছে নতুন আবাস, নতুন নিবাস। কখনও দুঃস্বপ্ন দেখি জলাভূমির মধ্যে বুনো লতা জড়িয়ে ধরেছে মারিয়াকে শক্ত করে, সমুদ্রের তলদেশে ওকে অক্টোপাস আষ্টেপৃষ্টে বেধে ফেলেছে। স্বপ্ন দেখে আর ঘুমাতে পারি না আমি। জেগে থাকি, বিছানা থেকে উঠে পড়ি, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, হাঁটতে থাকি খোলা রাস্তায়।

যে পথ দিয়ে হেঁটে বেড়াই সে পথকে আর চেনা মনে হয় না আমার। পথে কত ঘটনা। রূপকথার দিনের মতো, রাক্ষসেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে হাউমাউ খাও, মানুষের গন্ধ পাও; রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ঠোলা, হাউমাউ খাও মেয়েদের গন্ধ পাও। রাতের রাস্তা থেকে গার্মেন্টসের মেয়ে তুলে থানায় নিয়ে লকআপে তোলে তারা, হাড়মাংসে খায় কড়মড়িয়ে, কোর্টের বারান্দা থেকে বাচ্চা মেয়েকে তুলে নেয় তারা, অপুষ্ট মাংসে খায়

কচকচিয়ে।হ্রদের ধারে একদল ছাত্র ঘুরে বেড়ায় মহাআক্ষেপে, কী..ওরা খেতে পারে আমরা খেতে পারি না? চল, আমরাও খাব, খেয়ে খেয়ে একদিন খাইদাইয়ের শততম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করব। অপরাজেয় বাংলার কাছে এক একটা রুমের জানালা দিয়ে তাদের শিক্ষকেরা মুখ বাড়িয়ে হাসতে হাসতে বলে, আমরাও খাই, তবে বেলা দুইটার পরে রুমের মধ্যে নোটপত্র দিতে দিতে, এই বয়সে ওদের মতো রাস্তাঘাটে ঝোপঝাড়ে এইসব মানায় না কি? আমরা কি অতই অভদ্র? যেতে যেতে মহেশপুর, সেখানে এক গাছের সঙ্গে এক গৃহবধুকে বিবস্ত্র করে বেঁধে রেখেছে কারা; যেতে যেতে রাজশাহীর বাঘা, ঘরের মধ্যে ঢুকে দু'জন ভাবী-ননদ দু'জনারই শাড়ি খুলে ফেলেছে ব্লাউজ খুলে ফেলেছে কারা, তবে এদের বিবস্ত্র বলা যাবে না; যেতে যেতে গোদাগাড়ি, দেখি গম চুরি করার কথা বলাতে মারতে মারতে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারের শাড়ি ব্লাউজ সব খুলে তাকে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ইউ পি চেয়ারম্যান, কিন্তু বিবস্ত্র করা হয়েছে ভাবতেও ভয় পাই আমি, কেননা পেঙ্গুইগলরা তা বলতে মানা করেছে। কোথায় কোন ভাষা প্রয়োগ করতে হবে ভেবে পাই না। নিজের শিশ্নে হাত দিয়ে পুরুষত্বের দৃষ্টান্ত অনুভব করে পরিতৃপ্তি বোধ করি, যাক ঠোলা বাহিনী অন্তত আমাকে কিছু করবে না এই সান্ত্বনায়। কিন্তু ঠোলা বাহিনী এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়, হাত পাতে, হাতের মোটা রুলার দিয়ে ইচ্ছা হলে বারিও মারে। রাস্তার পাশে দোকানে বসে রুবেল আড্ডা দেয়। এই তোমার কাছে তো অস্ত্র আছে হে বলে নিয়ে যায় চুলের মুঠি ধরে। তারপর রুবেল আর ফিরে আসে না। ভেঙে যাওয়া ডানা নিয়ে ঈগলমাতা লাফাতে থাকে, এইবার আবার আমি আমার ডানা ফিরে পাব, ডাক হরতাল। নতুন করে যুদ্ধ শুরু কর, যাতে আবার ব্যাটারা পালিয়ে যায় একাত্তরের মতো ওই পারে। আমিও মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, যুদ্ধের কায়দা এখনও ভুলে যাই নি, আবারও যুদ্ধ করব যেমন করেছিলাম একাত্তরে। ফাচুক এক ছেলে বলে ওঠে, আপনার গেরিলা যুদ্ধের কৌশলটা আমাদের শিখিয়ে দিন ম্যাডাম। পাশে থেকে আরেকজন বলে, একটু ভুল হয়ে গেছে, দেশটা আসলে সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়েছে পচাত্তর সালে, আমি অনেকদিন রাস্তা ঝাড়ু দিয়েছি, অনেক ঝাড়ু দিয়ে এই সত্যি কথাটা জানতে পেরেছি। একজন আবার আমার মতো নিরীহ মানুষকে প্রশ্ন করে, শেখ মুজিব হত্যার বিচার যদি হয় তাহলে আমার ভায়ের ছেলেটা যে রক্ষী বাহিনীর হাতে মারা গেছে তারও তো বিচার হওয়া উচিত না কি বলেন? আমি কথা বলি না। সে প্রচণ্ড রোষ নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে উত্তরের প্রত্যাশাতে। আমি কথা বলছি না দেখে অধৈর্য হয়ে বলে, কি ভাই এখন কোনও কথা বলেন না কেন, আওয়ামী লীগ করেন না কি? আমি অসহায় বোধ করি, এইভাবে আমার গায়ে কেউ আওয়ামী লীগের দুর্গন্ধ লাগিয়ে দেবে, ব্যাপারটা কেমন দেখায়? কিন্তু সত্যি কথা বললেও কি বিশ্বাস করবে? শেষ পর্যন্ত বলেই বসি,

শোনেন ভাই, কারবালার প্রান্তরে অনেক মানুষই মারা গেছে, মানুষ কিন্তু শুধু হাসান, হোসেন, মীর কাশেম আর সখিনার মতো মানুষকেই মনে রেখেছে। আপনার ছেলের মতো, আমার বাবার মতো অনেকেই মারা যাবে, তাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, সিরাজ শিকদার, মনিরুজ্জামান তারা, কর্নেল তাহের এদের কথা আলাদা, এদের জন্যে প্রতি বছর আমাদের মোহররমের হাসান-হোসেনের মতোই শোক ঘিরে ধরবে। এজিদও যে হোসেনের কাটা মুণ্ড দেখে সীমারের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল সে কথা জানেন? কি, কিছু বুঝতে পারলেন? লোকটা কোনও কথা বলে না, আরও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

আমি এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরি। যদিও কোনও কাজ নেই আমার। কবে একটা প্রজেক্টের রিপোর্ট লেখার কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলাম সেটাই কাটাছেঁড়া করি। কিংবা হেঁটে বেড়াই উদ্দেশ্যবিহীন। আমার জামাতে কি খুব বেশি ময়লা জমেছে? প্যান্টটা কি নোংরা হয়ে গেছে? খুব বেশি কি বড় হয়ে গেছে দাড়ি? খুব কি শুকিয়ে গেছি? গা দিয়ে কি বের হয় দুর্গন্ধ? মারিয়া নিশ্চয়ই বলতে পারত। আরও অনেকেই হয়তো বলতে পারে। কিন্তু আমার কি তা আর বিশ্বাস হবে! রাত একটু বেশি হলে এইরকম এলোমেলো খানিকটা ঘুরে বেড়াতে বেশ ভাল লাগে আমার। রাতের ঢাকা দেখার মতো বটে। বলা নেই কওয়া নেই সারি সারি গাড়ি ও রিকশা ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গেল, জনসভা শেষ করে ভালো লাগছে না তাই গাড়ি ভাঙা শুরু হলো, একটু অন্ধকারের মধ্যে নারীপুরুষের দরদাম শুরু হল, অথবা টলটলে আলো ঠোলারাও দাঁড়িয়ে আছে তারপরও কয়েক পাণ্ডা এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল কারও ব্রিফকেস, গয়না, মানিব্যাগটা। একদল লোক আসে হা রে রে রে করে, ভাঙচুরে মেতে ওঠে, সামনে যাকে পায় তাকেই মারতে থাকে কোপাতে থাকে, আগুন জ্বালায় বাড়িঘরে দোকানপাটে, তারপর কাঙ্ক্ষিত মানুষটাকে হাতের কাছে পেয়ে চটের ছালায় ভরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে, ঠোলারা তখনও দাঁড়িয়ে থাকে। আমি আনমনে হেঁটে চলি আর ভাবি এই তবে জীবন, এই তবে ক্ষণজন্মা মানুষ! আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় রিকশা খোঁজা মানুষেরা, ভবঘুরেরা, মেয়েদের দালালেরা, গার্মেন্টসের মেয়েরা। ঠোলাদের কথা চিন্তা করতে করতে দেখি কি আশ্চর্য ব্যাপার, আমাকে দাঁড়াতে বলছে একটা ঠোলা। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি, কেননা মনে হয়, না দাঁড়ালে আরও ক্ষতি হবে। ঠোলাটা আমার সামনে এসে চেহারাসুরত দেখে ভাল করে, তারপর বলে,

মেয়েডার ঘড়ি নিলি ক্যান?

আমার অবাক হওয়ার পালা। আমি কেন ঘড়ি নিতে যাব? কোন মেয়ের ঘড়ি নেব? পুলিশ আমার পেছন দিকে ইঙ্গিত করে। আমি দেখি গার্মেন্টস-এর এক মেয়ে হেঁটে

যাচ্ছে। আমার বুঝতে অসুবিধা হয় না পুলিশ ভায়ের আসলে কিছু মালপানির দরকার এখন। সে তার রাইফেলটা ঝাঁকিয়ে আবারও বলে,

দে- ভাগ দে ব্যাটা। ট্যাক্স না দিয়াই জিনিস হাতাইতে চাস?

আমি টাকা দেব কোথা থেকে, আমার এখন পকেট ফাঁকা, যা আছে তাতে কোথাও যাওয়ার রিকশা ভাড়া হতে পারে বড়জোর। আমাকে তাই না-ই করতে হয়,

আরে ভাই, এটা তো আমার ঘড়ি। কি সব আবোল তাবোল বলছেন? ডাকেন দেখি ওই মেয়েকে। বলুক ও ঘড়ি নিয়েছি কি না।

ঠোলাটা খেঁকি দিয়ে ওঠে,

তোর ঘড়ি মানে? লাইসেন্স দেখা।

এখন এই রাত দশটার পরে, আমি যখন ঢাকার রাস্তাতে, তখন লাইসেন্স দেখাব কোথা থেকে? কেউ ঘড়ির লাইসেন্স করে কি না তাও তো জানি না আমি। কোনও দিন কোনও ঘড়ি কিনি নি আমি, ঘড়ি হল গিফট দেয়ার জিনিস, কেউ দিলে পড়ি, নষ্ট হয়ে গেলে আবারও গিফট না পাওয়া পর্যন্ত খালি হাতে থাকি। একবার ঘড়ি কিনে দিয়েছিল মামুন, আরেকবার টিটো আর সবশেষে মারিয়া। মারিয়া এটা কেনার রশিদ কোথায় রেখেছে কে জানে! আমি তাই অসহায়ের মতো এদিক ওদিক চাই। কিন্তু কেউই আমার দিকে ফিরে তাকায় না, বরং সমস্যা হতে পারে জন্যে আরও দ্রুত চলে যায় পাশ কাটিয়ে। আর ঠোলারা আমাকে ভ্যানে তোলে, ছিনতাইকারী হিসাবে নিয়ে যায় থানাতে। আমি আর কি করব, চুপচাপ ওরা কি করে তারই প্রতীক্ষাতে থাকি। থানায় নিয়ে যাওয়ার পরে ওরা আমাকে নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা না করেই সার্চ শুরু করে। আমি হাত তুলে দাঁড়াই। ওরা পকেট থেকে কাগজপত্র মানিব্যাগ এইসব বের করতে থাকে, হাত বুলাতে থাকে শরীরে কোনও কিছু লুকিয়ে রেখেছি কি না। তখনই বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়ে আমার, বাবার পিস্তলটা আমার কোমরে লুকিয়ে রাখা আছে। কিন্তু তখন আর কিইবা করার আছে আমার, তখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ওরা বার বার জিজ্ঞাসা করতে থাকে এই পিস্তল আমি কোথায় পেলাম, আমার নাম কি, আর কোনও নাম আছে কি না, কোন টেরর আমার নেতা, কোনও মন্ত্রীর কোনও মহল্লায় থাকি কি না, এই পিস্তল দিয়ে এর আগে কি কি করেছি। আমি কিছুই বলতে পারি না। ওরা কিভাবে বুঝবে ওই পিস্তলের সঙ্গে আমার কী প্রচণ্ড আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে, ওই পিস্তলের সাহচর্যে কী তীব্রভাবে বাবাকে অনুভব করি আমি। এসব তো বুঝিয়ে কোনওদিনই বলা যাবে না। ওরা আমাকে মারতে থাকে, মেরে মেরে কথা আদায় করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিইবা এমন কথা আছে আমার যে ওদের তা বলা

যাবে? এতদিন শুধু ইন্টারোগেশনের কথা শুনেই এসেছি। কিন্তু এবার পুলিশের হাতে পড়ে হাড়ে হাড়ে টের পেতে থাকি আমি যে ইন্টারোগেশন কাকে বলে। মাঝে মাঝে বিরতি দেয় ওরা। লকআপে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখে, একটু দানাপানি খাওয়ায়, তারপর খানিকটা তাজা হলে আবারও ইন্টারোগেশন শুরু করে। তিনদিনের দিন সকালে যখন ওরা আমাকে ডিবি'র লোকজনের সামনে আবারও নিয়ে গেল তখন তাদের খুব খুশি খুশি লাগল আমার। আমাকে বসিয়ে এক কাপ চা আর একটা সিগারেটও খেতে দিল। আমি সিগারেট টানতে টানতে আবারও তাদের প্রশ্ন শুনতে কিংবা আবারও উত্তর দিতে শুরু করলাম। প্রতিদিনই একই প্রশ্ন করে ওরা, উদ্দেশ্য দু'রকম স্টেটমেন্ট এলেই তুলোধুনো করবে। আজ কিন্তু প্রশ্নগুলোকে অন্যরকম মনে হতে লাগল আমার।

তাহলে আপনি বলছেন আপনার বাড়ি যশোর জেলায়?

জ্বি।

যশোরে ববিতার বাড়ি, আপনার জানা আছে?

জ্বি।

ববিতার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

জ্বী না। তাকে চিনি না আমি।

আচ্ছা আপনাদের ওখানে না কি অনেকেই নকশাল পার্টি করে?

হ্যাঁ, অনেকেই করে শুনেছি।

শুধু শুনেছেন? কারও সঙ্গে পরিচয় নেই?

জ্বি না, কারও সঙ্গে পরিচয় নেই।

আপনি কি জানেন আপনাদের ওখানে আবারও নকশালদের ধরপাকড় শুরু হয়েছে আর সবাই এখানে সেখানে আত্মগোপন করছে?

জানি।

কেমন করে জানলেন?

পেপারে পড়েছি।

আপনাদের গ্রামের হালিম মিয়ার সঙ্গে পরিচয় আছে?

জ্বি আছে।

সে এখন কোথায় বলতে পারেন?

মনে হয় বাড়িতেই আছে। বাড়ি ছাড়া আর কই যাবে?

আপনি কি জানেন সে সর্বহারা পার্টির মেম্বার?

আমি চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাই। না, এরকম কোনও কিছু তো জানা নেই আমার। ইন্টারোগেশন করা অফিসাররা আমাকে ওভাবে মুখ তুলে তাকাতে দেখে একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে মনের আনন্দে হাসতে থাকে, 'কি এবার তো ধরা পড়ে গেছ' মার্কা বিদ্রূপ ফুটে ওঠে তাদের চোখেমুখে। তারপর তারা একে একে যা প্রশ্ন করে, প্রশ্ন করার ছলে যা জানাতে থাকে তাতে আরও চমকাতে থাকি আমি। কেননা মনে হয় আমার চেয়ে আমাকে ওরাই ভাল চেনে। আমার বাবা যে বনেদি ঘরের ছেলে ছিল তা তো আমার জানা কথাই। কিন্তু জানা ছিল না, জন্মের আগেই বাবার বাবা মানে আমার দাদা মারা যাওয়াতে সম্পত্তিতে কোনও অধিকারই ছিল না তার। বাবার দাদা তাই সামান্য জমি সরাসরি বাবার নামে লিখে দিয়েছিল এতিম ছেলেটির ভবিষ্যত-আশংকা চিন্তা করে। বাবা বিয়ে করেছিল তার চাচার বিধবা স্ত্রীকে, তারই সন্তান আমি। ধর্মমতে এ বিয়ে জায়েজ, কিন্তু তবু বাবাকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল এই বিয়ের পরে। বাবা তার সংসার পেতেছিল তার দাদার দেয়া সামান্য মেঠো জমির ওপর ছনের একটা ছাপড়া তুলে। ইন্টারোগেশন অফিসার আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমার সৎ-বোনের নাম মণীষা হওয়ার কারণ আমি জানি কি না। আমি মাথা নাড়ি। অফিসারটি আবারও তথ্য যোগায় আমার সৎ-মা ছিল হিন্দু মেয়ে, কলকাতায় তার আসল বাড়ি, পার্টি করত চারু মজুমদারের, নকশাল স্বামী মারা যাওয়ার পরে নিরাপত্তা ও অন্যান্য সবকিছু চিন্তা করে সে চলে আসে এই দেশে। পরিচয় হওয়ার পরে বিয়ে হয় বাবার সঙ্গে। বিয়ের সবকিছু ঠিক করে আরেক নকশাল এই হালিম মিয়া। শুনতে শুনতে ভাবি, সত্যি মানুষ তার এক জীবনে কতটুকুই বা জানতে পারে! নিজেকেই তো চেনা হয় না তার ভাল করে। জগতের কথা দূরে থাক, নিজের পিতা পরিবার গোষ্ঠীর মানুষকেও কি সে চিনতে পারে আয়নার স্বচ্ছতায় প্রতিস্থাপন করে! ভবিষ্যত সে তো আরও দূরের ব্যাপার।

ইন্টারোগেশন অফিসার আবারও আমার হাত টেনে নেয়। একটা পেন্সিল দু'আঙুলের মধ্যে রেখে আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকে। কেননা তাদের মনে হয়, যে ছেলের পারিবারিক ইতিহাস এইরকম নিশ্চয়ই তার জানা আছে গোপন রাজনীতি করা মানুষজনের হদিস। জানা আছে এই তল্লাশির সময় তাদের কে কোথায় লুকিয়েছে। তাছাড়া আমিও নিশ্চয়ই ওই দলের কেউকেটা কেউ, নইলে আমার কাছে পিস্তল আসবে কোথা থেকে আর এরকম কড়া ইন্টারোগেশন সহ্য করার ক্ষমতাই বা আমি অর্জন করব কেমন করে। তারা আমাকে মারতে থাকে, আমার মুখ দিয়ে শরীর দিয়ে

রক্ত গড়াতে থাকে, কিন্তু তারা ক্ষান্ত হয় না, কখনও ইলেকট্রিক শট দিয়ে কখনও গরম পানি দিয়ে কখনওবা বাঁশের লাঠি দিয়ে ডলতে ডলতে প্রশ্ন করে চলে; প্রশ্ন করতে করতে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বিশ্রাম নেয়, আবারও শুরু করে। আমি নিস্তেজ হতে থাকি, নিস্তেজ হতে হতে বুঝতে পারি আর কোনওদিন আমি এই পৃথিবীর পথে হাঁটতে পারব না, কোথায় যেন একটা বর্ষাকালীন দ্বীপ-বাড়ি আছে সেখানে আর কোনওদিন যাওয়া হবে না, কিংবা উরুবেলা নামে এক গ্রাম ছিল কেউ তার কথা মনে রাখবে না, সিনেমা হলে ডেসটিনির বহ্নুৎসব দেখে কারও মনে হবে না এরকম সত্যিই ঘটেছিল এই দেশেও, জলাভূমিগুলো মরে যাবে এমনকি শীতের অতিথি পাখিরা এসেও আর মনে করবে না সুন্দরী সেই জলকন্যার কথা, মেঠো বাড়ির উঠানে সুজাতা এসে দাঁড়াবে না পায়সান্ন নিয়ে, অনেক কমলা রঙের রোদ কোথায় ছিল তা আর কেউই খুঁজে দেখবে না; ঈদের দিন বিকেলে আর কোনওদিনই আমি দেখব না দল বেঁধে মেয়েরা বেরিয়েছে পাড়া বেড়াতে, শব-ই-বরাতের রাতে তারাবাতি নিয়ে দৌড়ে যেতে দেখব না কাউকে, দেখব না দুরন্ত বালক মসজিদের মিনারে উঠে বসেছে মোমবাতি জ্বালাবার অদম্য স্পৃহা নিয়ে। আমি আমার আর কোনওদিন না দেখার তালিকা তৈরি করতে থাকি, যে প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই সে প্রশ্নের উত্তর আমিও খুঁজে ফিরি, প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমি নিথর হয়ে যেতে থাকি, ইন্টারোগেশন চলতে থাকে...

এক আশ্চর্য সুন্দর নির্মল স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমার মৃত্যু ঘটে।

বাবা, মণীষা আর আমি আকাশ ফর্সা হয়-হয় ভোরে হাঁটতে বেরিয়েছি। বাবা আমাদের চেনাচ্ছে দূরের নদী, হাঁটা পায়ের সড়ক, গাছের পাতা গাছের গোড়া গাছের ছায়া। দেখাচ্ছে কেমন করে মাটির মধ্যে থেকে উঁকি দেয় সবুজ পাতা, বাড়তে থাকে থনথনিয়ে। আর কুয়াশা নেমে আসে কেমন ধোঁয়া হয়ে, শিশির ঝরে পড়ে পাতায়, ঘাসে। এই যে পথ এ পথ দিয়ে কতদূরে যাবে মানুষ তা কিন্তু তার নিজেকেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। যদি সে মনে করে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাবে দিগন্ত রেখায় তাও কিন্তু সম্ভব সেই মানুষের পক্ষে। তবে মনে রাখতে হবে গ্রিক দেশের সেই বীরের কথা। অসম্ভব শক্তি ছিল এই বীরের, কেউ তাকে হারাতে পারত না। কিন্তু কি করে তার এক প্রতিদ্বন্দ্বী জেনে গিয়েছিল মাটি থেকে শূন্যে তুলতে পারলেই সে আর লড়তে পারে না। সে তাই প্রথমেই সেই বীরকে ধরে কাঁধে তুলে ফেলে। হেরে যায় বীর।

মানুষও ওইরকম। তার সমস্ত শক্তি এই মৃত্তিকাতে, মাটিতে পা রাখ শক্ত করে, তারপর আকাশের দিকে যতদূরে চাও, যত দূরে যাও কোনও ক্ষতি নেই, জয় তোমার হবেই। কিন্তু কারও মাথায় উঠে আকাশ দেখতে চেও না, চারপাশে তাকাতে যেও না। আর ওই হেক্টরের কথাও মনে রেখ, পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে। বলতে বলতে বাবা আমাদের নিয়ে হেঁটে চলে। রাস্তার পাশের জলাভূমি থেকে মৎস্যকন্যার মতো উঠে আসে মারিয়া, দৌড়াতে দৌড়াতে এসে আমার হাত ধরে। আমরা হেঁটে চলি। ভোরের আকাশে দু'টো পাখি গান গাওয়া শুরু করে আর আমি তাকাতেই মামুন আর শুভ্রা হয়ে সঙ্গ নেয় আমাদের। আমরা হেঁটে চলি। মা আমাদের জন্যে রান্নাঘরে চুলা জ্বালে, রান্না শুরু করে। তার কপালে এক-একটা শিশির ফুটে ওঠে উনুনের আঁচে আর এক-একটা মানুষ-তাড়ুয়া আবারও মানুষ হয়ে ওঠে। মানুষ হয়ে উঠে তারাও আমাদের হাত ধরে হাঁটতে থাকে। গ্রাম পেরিয়ে নদী পেরিয়ে খাল পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে আমরা হেঁটে চলি, মায়ের কপালে শিশির ফুটতে থাকে,আমাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমাদের গতি থামানোর জন্যে বাহিনীর পর বাহিনী আসে, মুজিব বাহিনী আসে, রাত বাহিনী আসে, রক্ষী বাহিনী আসে, লাল বাহিনী আসে, গণ বাহিনী আসে, জলপাই বাহিনী আসে, রগকাটা বাহিনী আসে, ফতোয়াবাজ বাহিনী আসে, ঠোলা বাহিনী আসে, ঈগল বাহিনী আসে, পেঙ্গুইগল বাহিনী আসে, বাহিনী আসতেই থাকে, বাহিনী আরামে দাঁড়ায়, সোজা হয়, ডানে ঘোরে, বামে ঘোরে, ফরোয়ার্ড মার্চপাস্ট করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, আমরা থামি না, তারা আমাদের হত্যা করে, কিন্তু মায়ের কপালে শিশির ফুটতেই থাকে, আমরাও পুণর্জন্ম নিতে থাকি, আমরা তাদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এসে হাঁটতে থাকি, হাঁটতে আমরা তরুণ হয়ে উঠি, এত তরুণ যে আমাদের কিশোর মনে হয়, এত কিশোর যে আমাদের বালক মনে হয়, এত বালক যে আমাদের শিশু মনে হয়, আমরা হাজার হাজার শিশু হুটোপুটি করতে করতে, পাখির কিচিরমিচির তুলতে তুলতে নদীর মতো কলকলিয়ে, বানের পানির মতো খলখলিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকি, বাড়ির উঠোনে এসে হল্লা করতে থাকি, মা বেরিয়ে আসে, মা বাবার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে, মা'র কপালের শিশির গড়িয়ে পড়তে থাকে মাটির ওপর, মা তা একটুও মোছার চেষ্টা করে না, মা কেবল আমাদের দিকে তাকিয়ে মায়া-মায়া চোখে অবিরাম হেসে চলে...

আর আমাদের সবাইকে ধোয়াওড়া রোয়া রোয়া ভাত বেড়ে দিতে থাকে।

রচনা : নয় ডিসেম্বর, ১৯৯৮, লেকসার্কাস কলাবাগান, ঢাকা।

MADE BY
AR GALIB